দাম : সাত টাকা

স্বস্তিকা

৬৪ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা।। ২ এপ্রিল - ২০১২।। ১৯ চৈত্র - ১৪১৮

আদর্শের সঙ্কটে ভারতের কমিউনিস্টরা

জাতীয় জলনীতি বিল নিয়ে আর এস এসের প্রস্তাব — পৃঃ ... ১৯-২০

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৭

দেশের কোনও রাষ্ট্রপতি বিদেশ সফরে এত টাকা খরচ করেননি □ ৮

দীনেশের অপসারণের পিছনে মানি ব্যাগ? □ ৯

সকামের রাজত্ব, বাম-রাজ্য ও রাম-রাজ্যের পার্থক্য □ ডঃ স্বরূপ ঘোষ □ ১১

মতাদর্শের সঙ্কটে কমিউনিস্টরা □ বলবীর কে পুঞ্জ □ ১৩

এদেশের কমিউনিস্টরা ভারতীয় হতে রাজি নন □ নিশাকর সোম □ ১৫

বামেদের ভারতীয়ত্বে ফেরার তাগিদ □ সুমিত চক্রবর্তী □ ১৭

আমাদের সমাজের ঐক্য ও সংহতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ : আর এস এস □ ১৯

জাতীয় জলনীতি বিল—২০১২ নিয়ে পুনরায় ভাবনা-চিন্তা করা দরকার □ ২০

খোলা চিঠি : একা সুশান্তয় রক্ষা নেই, লক্ষ্মণ দোসর □ সুন্দর মৌলিক □ ২১

ক্ষীরপাই-এর মন্দির □ ডঃ প্রণব রায় □ ২৩

শতবর্ষে 'ডাকঘর' : নববর্ষে সংস্কার ভারতী-র অভিনব দেওয়ালপঞ্জী □ বিকাশ ভট্টাচার্য □ ২৫

নারী পরিচালকদের নাট্যোৎসব : 'নারীর মঞ্চ' ২০১২ □ দেবাদিত্য চক্রবর্তী □ ৩০

জনমেজয়-বৈশম্পায়ন সংবাদ : আক্রান্ত হলেও পাল্টা আক্রমণ না করার নীতি নিতেই হীনবল হিন্দুরা □ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ১০ □ □ চিঠিপত্র : ২২ □ □ ভাবনা-চিন্তা : ২৩ □ □ অঙ্গনা : ২৬ □ অন্যরকম : ২৭ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ২৮-২৯ □ □ শব্দরূপ : ৩১ □ চিত্রকথা : ৩৩

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

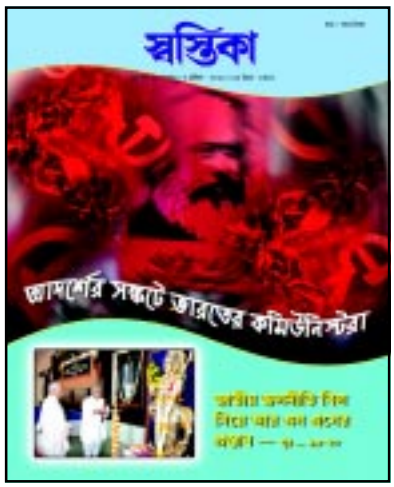

আদর্শের সঙ্কটে ভারতের কমিউনিস্টরা— পৃ : ১৫-১৭

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৩১ সংখ্যা, ১৯ চৈত্র, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ২ এপ্রিল - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

সম্পাদকীয়

আন্নার আন্দোলনের দ্বিতীয় দফা

আবারও নুতন দিল্লীর রামলীলা ময়দানে দুর্নীতির অবসানে জনলোকপাল বিল সত্বর প্রণয়ণের দাবীতে প্রতীকী অনশনে আন্না হাজারে। অদৃষ্টের কী নিদারুণ পরিহাস— গান্ধীবাদী আন্না হাজারে আজ গান্ধীজীর ভাবশিষ্যদের বিরুদ্ধেই রামলীলা ময়দানে এক অসম লড়াইয়ে অসীম সাহসে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যদিও গান্ধীজীর অনুগামীরা, যাহারা কেন্দ্রে শাসকদলের প্রধান শরিক—তাহারা গান্ধীজীর সত্য-অহিংসা-গ্রাম-স্বরাজ ও রামরাজ্যের নীতিকে বাস্তবে কতটা অনুসরণ করেন তাহা লইয়া যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

সে যাহাই হউক, এইবার আন্নাকে আর বুজরুকি দিয়া ঠেকাইবার, স্তোকবাক্যে ময়দান হইতে ঘরে ফেরত পাঠাইবার কোনও অবকাশ নাই। রামলীলা ময়দানের একদিনের প্রতীকী অনশন মঞ্চ হইতে আন্না যে বার্তা দিয়াছেন তাহাতে ক্ষমতাসীন এবং দুর্নীতিবাজদের হৃদ্‌কম্প না হইয়া উপায় নাই। আন্নার ডাক ঠিক যেন 'ডু অর ডাই'। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন—জনলোকপাল বিল প্রণয়ন করিতে না পারিলে আগামী লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রের ক্ষমতা হইতে গদিচ্যুত করিতে আন্না ও তাঁহার দলবল জনতার দরবারে আর্জি জানাইতে হাজির হইবেন। এবং সেই অভিযানে তিনি যোগগুরু বাবা রামদেব ও তাঁহার অনুগামীদেরকেও সামিল করিবেন। স্বাভাবিকভাবে দেশের সজ্জনশক্তি, সন্তশক্তিও আন্না হাজারে এবং বাবা রামদেবকেই যে অনুসরণ করিবেন তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এই সম্মিলিত শক্তির নিনাদিত প্রচারে কেন্দ্রের মূল শাসক দলের কি গতি হয় তাহা আন্না স্বয়ং প্রচারে নামিয়া হরিয়ানার একটি লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

সংসদের বিগত অধিবেশনে বহুচর্চিত লোকপাল বিল বিরোধী দলের সংশোধনী অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের মতো করিয়া পাস করাইতে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছেন কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন 'ইউপিএ' সরকার। সংসদের চলতি অধিবেশনে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলভুক্ত নেতাদের সহিত আলোচনার টেবিলে বসিয়া ঐক্যমত্যে পৌঁছাইতে পারেন নাই। বিরোধীপক্ষ তাঁহাদের সংশোধনীর বিষয়ে অনড় রহিয়াছেন। সুতরাং সরকারি লোকপাল বিলের কি গতি হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই লড়াইয়ের ময়দানে দ্বিতীয় দফায় টীম আন্না সোজা ব্যাটে খেলিতেছেন। লক্ষ্য ২০১৪ সালের সংসদীয় নির্বাচনে জনলোকপাল বিলের বিরোধীদের দিল্লীর মসনদ হইতে উৎখাত করিবেন বলিয়া দিয়াছেন। স্তোকবাক্যে ফেরত পাঠানো অথবা মধ্যরাত্রিতে শান্তিপূর্ণ নিদ্রিত জনতাকে 'অশান্তি করিতেছেন'— এই অজুহাতে পুলিশ দিয়া লাঠিপেটা করিয়া বিতাড়িত করিবার পথও রুদ্ধ। কেননা মহামান্য আদালত 'নিদ্রিতাবস্থায়' লগুড়াঘাত অনৈতিক এবং জনতার মৌলিক অধিকারের হনন বলিয়া দিল্লী পুলিশকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। যাহাদের কিছুমাত্র নীতি-নৈতিকতা অবশিষ্ট আছে তাহারা নিশ্চয়ই আন্নার সুরে সুর মিলাইবেন ইহা বলাই বাহুল্য।

দেশের স্থলসেনা প্রধান আবার এক দুর্নীতির অভিযোগ জানাইয়া মুখ খুলিয়াছেন। সংসদে বিরোধীদের সম্মিলিত আক্রমণ আপাতত ধামাচাপা দিতে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী সি বি আই তদন্তের সুপারিশ করিয়াছেন। সম্মুখ সমরে প্রাণের বাজি রাখিয়া যাহারা স্বদেশ রক্ষায় অবতীর্ণ হন, তাহাদের হাতে নিম্নমানের সমরাস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম তুলিয়া দেওয়ার এক পরম্পরা বহুপূর্ব হইতেই শুরু হইয়াছে।

বফর্স কামান ক্রয় কেলেঙ্কারী ঘুষের বিষয়টা প্রকাশ্যে আনিয়াছিল। তাহার ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রে রাজীব গান্ধী সরকারের পতন ঘটে পরবর্তী নির্বাচনে (১৯৮৯)। জনগণের টাকা জনগণকে ধোঁকা দিয়া অপচয় ও বিদেশে গোপন খাতায় জমা করিবার মতো নীচ হীন জঘন্য কাজ আর অন্য কিছু হইতে পারে না। সেক্ষেত্রে জনলোকপাল বিল এবং সরকারী অধিকারীদের কাজের জবাবদিহি করিবার নীতি নিতান্তই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং আজ দেশবাসীকে আন্না হাজারে এবং তাহার আন্দোলনকে সমর্থন করিয়া বলিতে হইবে— 'আন্নাজী আগে বড়ো, হাম তুম্‌হারে সাথ হ্যায়।'

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

ভারতীয় জাতি নষ্ট হইবার নহে। মৃত্যুকে উপহাস করিয়া ভারতবাসী নিজ মহিমায় বিরাজিত রহিয়াছে এবং যতদিন ভারতের জাতীয় ভিত্তিস্বরূপ ধর্মভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, যতদিন ভারতের লোক ধর্মকে ছাড়িয়া বিষয়সুখে উন্মত্ত না হইবে, যতদিন ভারতবাসীরা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ না করিবে, ততদিন তাহারা এইরূপই থাকিবে। হয়তো তাহারা চিরকাল ভিক্ষুক ও দরিদ্র থাকিবে, ধূলি ও মলিনতার মধ্যে হয়তো তাহাদিগকে চিরদিন থাকিতে হইবে, কিন্তু তাহারা যেন তাহাদের ঈশ্বরকে পরিত্যাগ না করে; তাহারা যে ঋষির বংশধর, একথা যেন তাহারা ভুলিয়া না যায়। যেমন পাশ্চাত্য দেশে একটি মুটে-মজুর পর্যন্ত মধ্যযুগের কোন দস্যু-'ব্যারনে'র বংশধররূপে আপনাকে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে, ভারতে তেমনি সিংহাসনারূঢ় সম্রাট পর্যন্ত ঋষির বংশধররূপে নিজেকে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করেন। আমরা এইরূপ ঋষিগণেরই বংশধর বলিয়া পরিচিত হইতে চাই; আর যতদিন পুণ্যচরিত্রের উপর এইরূপ গভীর শ্রদ্ধা থাকিবে, ততদিন ভারতের বিনাশ নাই।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সন্ত্রাসগ্রস্ত কাশ্মীর উপত্যকায় মেয়েরাই আশার আলো

শঙ্কর পাল।। মুনিরা মনজুর। কাশ্মীর উপত্যকার বাদগাঁও জেলার জুহামা গ্রামের এক কিশোরী। তার বসতবাড়ির দরজায় মৃদু করাঘাত জীবনের ধারাটাই পালটে গেল।

সালটা ছিল ১৯৯৭, কাশ্মীর উপত্যকায় তখন সর্বাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত সন্ত্রাসবাদীরা দিবারাত্র দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ফলে উপত্যকা হিন্দুশূন্য। স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়েছে— বিশেষত প্রত্যন্ত গ্রামে। ডাক্তারদের বেশীরভাগই ছিলেন সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের। মুসলমান উগ্রপন্থীদের অত্যাচারে তাঁরা কাশ্মীর ছেড়ে পালিয়েছেন। ফলে কী সরকারী, কী বেসরকারী— সবরকম স্বাস্থ্য পরিষেবার অবস্থা খুবই করুণ। সামান্য কাটা-ছেঁড়ার চিকিৎসা করারও লোক নেই। স্বাস্থ্য-সহায়ক কর্মীও অমিল। সবচেয়ে বাজে অবস্থা মেয়েদের, বিশেষত গর্ভবতী মেয়েদের। কেননা সবচেয়ে কাছের 'প্রসূতিসদন' হলো শ্রীনগরের 'লালদেদ হাসপাতাল'। সেখানে পৌঁছাতে অনেক সময় লেগে যায়। ৩৫ বছরের মুনিরার কথায়— 'শ্রীনগর যাওয়ার পথে অনেক জায়গাতেই সেনাদের গাড়ীতে খানাতল্লাসির সম্মুখীন হতে হয়।'

এই বিষম পরিস্থিতিতে বিষয়টা মাথায় ঢোকালেন ডঃ আলি মহম্মদ মীর— জনৈক অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস অফিসার। তিনি চাইছিলেন সমস্যাটার সামান্য কিছু হলেও সমাধানের পথে যেতে। সেজন্য তিনি গাঁটছড়া বাঁধলেন 'জম্মু-কাশ্মীর ভলান্টারি হেলথ্ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি একটি সংস্থার সঙ্গে। পৌঁছাতে চাইলেন চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত প্রত্যন্ত এলাকার দূর-দূর গ্রামে। বাদগাঁম জেলার দশটি, পুলওমা জেলার সাতটি এবং খানসাবের পাল- সীমান্তের পাঁচটি গ্রামকে তিনি নির্দিষ্ট করে নিলেন কাজ শুরু করার জন্য। সহযোগী এন জি ও-টির সাহায্যে প্রথমে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং অন্যান্য চিকিৎসার জন্য শিবির অনুষ্ঠিত হলো। দেখা গেল মায়েরা পুরুষ ডাক্তারদের কাছে চিকিৎসা করাতে সঙ্কোচবোধ করছে। তখন তাঁরা ঠিক করেন— মেয়েদের চিকিৎসার সুবিধার জন্য উপত্যকার মেয়েদেরকেই প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাস্থ্য-সহায়িকা হিসেবে গড়ে তুলবেন।

মহম্মদ মীর নিজেই উপত্যকার গ্রামে গ্রামে দরজায় দরজায় ঘুরেছেন। মা-বোনেদের স্বেচ্ছাসেবিকা হওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। এভাবেই মুনিরার দরজাতে কড়ানাড়া হয়েছিল। এবং মুনিরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি ওখানেই স্বাস্থ্য সহায়িকা, প্রসূতি সহায়িকা এবং 'ট্রমা' কাউন্সেলিং

বিষয়ে শিক্ষা নেন। প্রশিক্ষণ দেন জম্মু-কাশ্মীর ভালান্টারি হেলথ্ ডেভল্যাপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন-এ। গ্রামে গ্রামে বহির্বিভাগ চিকিৎসা এবং প্রশিক্ষণ দুটোই চালাচ্ছেন।

নবম শ্রেণীতেই স্কুলছুট মুনিরা কখনও ভাবেনি যে, তার দ্বারাও এরকম সেবামূলক কাজ হতে পারে। ডঃ মহম্মদ মীর তাকে এই সুযোগ দেওয়াতে তিনি কৃতজ্ঞ। মুনিরার কথায়— ''আমি এখানেই প্রসবকালীন এবং প্রসবের পরবর্তী পরিচর্যা বিষয়ে জেনেছি। তারপরই বাড়ি বাড়ি গিয়ে গর্ভবতী মেয়েদের নাম নথিভুক্ত করা শুরু করি।'' প্রশিক্ষণে যুক্ত মেয়েদের স্বাস্থ্যবিষয়ে কীভাবে কথাবার্তা বলতে হবে তাও শেখানো হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদে জর্জরিত উপত্যকায় কাজটা কিন্তু খুব সহজ ছিল না। জীবনের ঝুঁকি তো ছিলই। কিন্তু ঝুঁকি নিয়েই ঝাঁপিয়েছেন মুনিরারা। পরে মুনিরার দল ভারী হয়েছে। একে একে এসে যোগ দিয়েছেন— হাসিনা বেগম, সাকিনা সফি, সফীনা এবং আরও অনেকে। প্রথম প্রথম এরা সবাই নিরাপত্তার অভাব বোধ করতেন। তবে কাজটা অরাজনৈতিক হওয়ার কারণে, গ্রামীণ মহিলাদের স্বাস্থ্য-সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালনের কারণে ঘোরাফেরা অনেক সহজ হয়েছে।

মীর-এর মেয়ে এবং প্রশিক্ষক এজাবর আলি বলেছেন— যেহেতু তাঁদের সব কাজকর্ম প্রকাশ্যে হোত সেজন্য সবাই জানতে পারত তাঁরা কি করছেন। অনেকসময় লোক ঠাট্টা করে বলত— ওই দেখ, ডাক্তার আসছে। তাতে খারাপ লাগত।

জুহামা গ্রামের সফীনা গত পাঁচ বছর যাবৎ স্বাস্থ্য সহায়িকার কাজ করে চলেছেন। তাঁর প্রেরণা মুনিরা। মুনিরা এখন যেসব মেয়েদের নানা কারণে নার্ভাস সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাঁদেরকে কাউন্সেলিং করান। ট্রমা কাউন্সেলিং এবং মানসিক ব্যাধি— দুটি প্রধান সমস্যা। শত শত মা সন্তানহারা— তারা হয় সন্ত্রাসবাদীদের হাতে মারা পড়েছে অথবা নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছে। আবার অনেক মেয়ে স্বামীহারা হয়েছে। বছরের পর বছর নিখোঁজ অনেকেই। যদিও এসময়ে হিংসা অনেক কমে এসেছে। কিন্তু সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা বেড়েছে। কমবয়সী ও প্রাপ্তবয়স্কদের মানসিক ভারসাম্য বহুক্ষেত্রে বিঘ্নিত হয়েছে। গ্রামের বহু মা নির্জনতা ও একাকিত্বের শিকার। সফীনার মতো যারা কাউন্সেলিং করছেন তাঁরা এখন সহানুভূতির সঙ্গে ওইসব হতাশাগ্রস্ত মহিলাদের কানে আশার বাণী শোনাচ্ছেন। একদিকে স্বাস্থ্যসহায়িকারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন, অন্যদিকে গ্রামীণ মহিলারা স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে সচেতন হচ্ছেন। এরকম এক সন্তানহারা মায়ের কাছে নিয়মিত যাচ্ছেন সফীনা। স্বল্পমাত্রার ঘুমের ওষুধে অনেক কাজ হচ্ছে। তাঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়ছে।

২০০৮ থেকে অনেক হরতাল, বনধ্ দেখেছে কাশ্মীরবাসীরা, এর ফলে, মানুষের রোজগার বন্ধ হয়ে যায়। বনধ্ ডাকলে তা অমান্য করতে গ্রামবাসীরা ভয় পায়। নিরাশায় ভুগে পুরুষরা স্ত্রীকে তো মারধর করেই, অনেক সময় ছেলে-মেয়েরাও বাদ যায় না। বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সন্ত্রাসবাদীদের কাউকে জবাবদিহি করার কোনও দায় নেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বনধ্ তারাই ডাকে।

এসময়ে প্রায় ৫০ জন স্বাস্থ্য-সহায়িকা বা স্বেচ্ছাসেবিকারা কাজ করছেন। স্থানীয় মানুষের কাছে তাঁরা আদর্শ সেবিকার প্রতিমূর্তি। আগে শুধু ছেলেরা স্কুলে যেত, এখন মেয়েদেরকেও স্কুলে পাঠাচ্ছেন। এই মেয়েরাও মুনিরা, সফীনাদের মতো আগামীদিনে ঘর-পরিবার ও এলাকার উন্নয়নের কাজে সামিল হবে বলে তাদের আশা।

হরিদ্বারে চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন

প্রাচীন ঐতিহ্যের মাধ্যমে আজকের অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব : মোহন ভাগবত

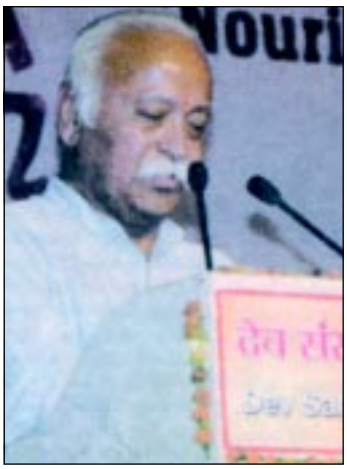

সংবাদদাতা ।। প্রাচীন ঐতিহ্য অনেকরকম ভাবে সমাধান করতে পারে আজকের বহু সমস্যার। সে ব্যাপারে আমাদের মুক্ত দৃষ্টি থাকলে ব্যাপক পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে আনা সম্ভব। হরিদ্বারে প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই কথাগুলো বলেছেন রাষ্ট্রীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীমোহন ভাগবত।

সম্মেলন শুরু হয়েছিল ৪ মার্চ। অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল বর্ণময় শোভাযাত্রার মাধ্যমে। প্রাচীন ঘরানা মেনে নৃত্যবাদ্যে সাজানো হয়েছিল শোভাযাত্রা। অনুষ্ঠান যৌথভাবে আয়োজন করে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর কালচারাল স্টাডিজ এবং দেব সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়। অংশ নেন ৩৩টি দেশের ৪৫৮ জন প্রতিনিধি। সম্মেলনে গুরুত্ব দেওয়া হয় প্রকৃতিকে যথাযথ মর্যাদায় দেখার ব্যাপারকে। ভারতীয় সনাতনী ভাবনায় রয়েছে 'বাঁচাও ও বাঁচতে দাও', 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য', 'পৃথিবী এক পরিবার', আসুন এই পৃথিবীকে আমরা মহান করি'। এদেশের মঙ্গলভাবনাকে দেওয়া হয়েছিল আন্তর্জাতিক রূপ। নিউজিল্যান্ডের মাওরিরা এসেছিল। আমেরিকা থেকে এসেছিল প্রাচীন সম্প্রদায়, ইউরোপের দেশ থেকে এসেছিল প্রাচীন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা।

১৯৯৪ সালে নাগপুরে সক্রিয় ভূমিকা নেয় ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর কালচারাল স্টাডিজ। পৃথিবীর সব দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের পরিচয় তুলে ধরে তার মধ্যেকার যে সহজ সর্বজনীন রূপ রয়েছে তাকে পরস্পরের কাছে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর মধ্যে গুরুত্ব পায় বিশ্ব মানবতার এক রূপ। সেইসঙ্গে উদ্যোগ নেওয়া হয় এইসব দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষা এবং সে সম্পর্কে গবেষণার। ২০০৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন হয়ে আসছে প্রতি তিন বছর অন্তর। এখন যা হয়ে উঠেছে একটি মঞ্চ, যেখানে ঐতিহ্যের পরম্পরাকে তুলে ধরা হচ্ছে। পৃথিবীর অন্য দেশের প্রাচীন জীবনধারার মধ্যে কোথায় কি সাদৃশ্য রয়েছে এবং কীভাবে তা রক্ষা করা যায় তা নিয়ে ভাবা হচ্ছে সমবেতভাবে।

প্রথম সম্মেলন হয়েছিল ২০০৩-এ মুম্বাইয়ে। মূল ভাবনা ছিল : 'আমরা প্রত্যেকে এক'। এবারের সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন 'আই সি সি এস'-এর সভাপতি অধ্যাপক রাধেশ্যাম দ্বিবেদী। এরপরই পৃথিবীর ২৩টি প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহনকারীরা প্রার্থনা করেন। সেই প্রার্থনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল বিভিন্ন পদ্ধতি ও ভাষায় এক সনাতনী আন্তর্জাতিক ভাবনা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আর্যবিদ্যা গুরুকুলম-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলেন, আমরা উত্তরাধিকার বহন করছি যে সমৃদ্ধ ও বর্ণময় প্রাচীন সংস্কৃতির তা রক্ষা করার দায়িত্ব রয়েছে আমাদের। দেব সংস্কৃতি বিদ্যালয়ের আচার্য ডঃ প্রণব পাণ্ডে বলেন, আমাদের উচিত বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যকে রক্ষা করা। প্রতিদিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির রূপ উপস্থাপন। জল আগুন নিয়ে প্রত্যেক দেশে প্রায় একই রকম প্রথা ও আচার মানা হয়। তার মধ্যে ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আচার। প্রকৃতি পূজাই ছিল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূলে। মাটি, বাতাস, জল, আগুন, আকাশ ছিল উপাসনার মূল ভাবনা। পৃথিবী মা-কে ভালোবাসো— এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয় আচারে ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। এই সম্মেলনে বিভিন্ন সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ পড়া হয়। আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ দি ওয়ার্ল্ড অ্যান্সিয়েন্ট ট্রাডিশন অ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজ পাঁচজন নামী মানুষকে তাঁদের অবদানের জন্যে সাম্মানিক পি এইচ ডি অর্পণ করে। বিভিন্ন দেশের পাঁচজনের মধ্যে ছিলেন একজন ভারতীয়। জগদেও রাম ওঁরাও, তিনি অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত।

গত ২১ মার্চ কেশব ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নাগপুরে প্রতিনিধি সভার সদ্যসমাপ্ত অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবদ্বয়ের আলোচনায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশের কোনও রাষ্ট্রপতি বিদেশ সফরে এত টাকা খরচ করেননি

গূঢ়পুরুষের

কলম

রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের বিশেষ সফরের জন্য দেশবাসীকে দিতে হয়েছে ২০৫ কোটি টাকা। দেশের সাধারণ মানুষের দেওয়া কর থেকে কেন্দ্রে কংগ্রেসের জোট সরকার এই বিপুল অর্থ রাষ্ট্রপতির সফরে ব্যয় করেছে। অতীতে দেশের দ্বিতীয় কোনও রাষ্ট্রপতি তাঁদের পাঁচ বছরের মেয়াদে এত টাকা বিদেশ সফরে খরচ করেননি। প্রতিভা পাতিল খরচ করেছেন। কারণ, তাঁর প্রতিটি বিদেশ সফরে বেড়াতে গেছেন তাঁর বাপের বাড়ি— শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় স্বজনের বড় সড় দল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশেষ বিলাসবহুল এয়ার ইন্ডিয়ার জেট। প্লেনের ভাড়ায় লেগেছে ১৫৩ কোটি টাকা। রাষ্ট্রপতির বিরাট পরিবারের আত্মীয়-স্বজন গত প্রায় পাঁচ বছর ধরে একদম ফ্রিতে দিল্লীর রাজকীয় রাষ্ট্রপতি ভবনে বাস করছেন। এই বিরাট পরিবারের লোকজনের খানাপিনা পারিবারিক উৎসবের খরচ মেটানো হয় আম জনতার ট্যাক্সের টাকা থেকে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির খরচের উপর রাশ টানা চলে না। দেশের রাষ্ট্রপতির পদ অতি সম্মানীয়। তিনি সেনা প্রধান। তিনি দেশের আইন ও বিচার বিভাগের প্রধান। রাষ্ট্রপতির নামেই ভারতের প্রশাসনিক কাজকর্ম চলে। সংবিধান প্রণেতারা ধরে নিয়েছিলেন এমন একটি সম্মানীয় পদে দেশের 'এক নম্বর' মানুষটিই বসবেন। প্রতিভা পাতিলের মতো অতি সাধারণমানের একজন কংগ্রেসী রাজনীতিক নন। অতীতে মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী থাকাকালে তাঁর প্রভাব খাটিয়ে প্রতিভা পাতিলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন কৃষি সমবায় ব্যাঙ্কের তহবিল তছরূপ করার অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত আজও হয়নি। গত ফেব্রুয়ারি মাসে পাঁচ রাজ্যে নির্বাচনী প্রচার চলাকালে প্রতিভা পাতিলের 'সুযোগ্য' পুত্র কয়েক কোটি টাকার কারেন্সি নোট ট্রাঙ্কে করা পাচার করার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। প্রতিভা-পুত্র দাবি করেছিলেন যে এই বিপুল ক্যাশ টাকা নির্বাচনী প্রচারের খরচ মেটাতে কংগ্রেস দল তাঁকে দিয়েছে। অথচ এই দাবির সমর্থনে প্রতিভা-পুত্র কোনও কাগজপত্র দেখাতে পারেননি।

কিন্তু তারপর কী হলো, সে সম্পর্কে পরে সংবাদমাধ্যম মুখে কুলুপ আঁটে। অথচ রাষ্ট্রপতির পুত্রকে অঘোষিত কালো টাকার কারবারি হিসাবে গ্রেফতার করা উচিত ছিল পুলিশের। সেই অবশ্য কর্তব্যটি পালন করা হয়নি। উল্টে পুরো বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়া হয়। মহারাষ্ট্রের সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতারণায় প্রতিভা পাতিলের স্বামী অভিযুক্ত হন। পরে প্রতিভা পাতিল রাষ্ট্রপতি হয়ে

গেলে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর এমন গুণধর পরিবারের লোকজন সকলেই গত পাঁচ বছর ধরে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাজকীয় বিলাসে তোফা দিন কাটিয়েছেন। প্রতিভা পাতিলের খুব ইচ্ছা ছিল আরও পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি পদে থাকার। কংগ্রেস দুর্নীতিপরায়ণ একটি রাজনৈতিক দল। কিন্তু রাষ্ট্রপতির আত্মীয় স্বজনদের দুর্নীতি দেখে এই দলেরই নেতাদের চোখ কপালে উঠেছে। তাই প্রতিভার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হলো না। কংগ্রেস হাইকম্যান্ড মুসলিম নেতা ও উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারিকে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হিসাবে মনোনয়ন দিতে চাইছে। তবে লোকসভা ও রাজ্যসভায় এখন কংগ্রেসের প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাংসদ নেই। রাষ্ট্রপতি পদে দলের প্রার্থীকে জেতাতে গেলে আঞ্চলিক দলগুলির সাংসদদের সমর্থন প্রয়োজন। আর মাস চারেক পরেই রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন হবে। তার আগেই রাষ্ট্রপতি পদের প্রভাব খাটিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের দুর্নীতির বিষয়টি বিরোধী দল তুলতে পারে। সেই আশঙ্কায় কংগ্রেস হাইকম্যান্ড প্রতিভা পাতিলকে সদলবলে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে সরাতে চাইছে।

ভারতের সর্বোচ্চ সরকারি পদ থেকে প্রশাসনের একেবারে নিচের তলা পর্যন্ত দুর্নীতির ঘুনপোকা আমাদের গণতান্ত্রিক কাঠামোটাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে। সরকারি প্রশাসনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে একজন আন্না হাজারে বা একজন বাবা রামদেব অনশন সত্যাগ্রহ করলে কিছু হবে না। দেশের প্রতিটি সৎ, বিবেকবান নাগরিককে দেশের স্বার্থে, দেশের মানুষের স্বার্থে, নিজের নিজের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে এগিয়ে আসতে হবে। সঙ্ঘ শক্তিই আসল শক্তি। সঙ্ঘবদ্ধ মানুষই পারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সত্যিকারের লড়াই লড়তে। দেশের মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে লাগাতার কর্মসূচি নিতে হবে। তিন মাস বাদে একদিন উপবাস করলে অথবা মাঝে মধ্যে 'জেল ভরো'-র ডাক দিলে দুর্নীতি বিদায় সম্ভব নয়।

স্বস্তিকা

নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন

আগামী ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যা ৫.৩০ টায় কলকাতায় কেশব ভবনে (৯এ, অভেদানন্দ রোড, কলিকাতা — ৬) স্বস্তিকা'র নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন অনুষ্ঠান হবে। শুরুতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনায় থাকছেন সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা। স্বস্তিকা'র এবারের নববর্ষ সংখ্যার বিষয় : সমাজ জীবনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অবদান।

অনুষ্ঠানে স্বস্তিকা'র সকল লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সকল শুভানুধ্যায়ীদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

— স্বস্তিকা পরিবার

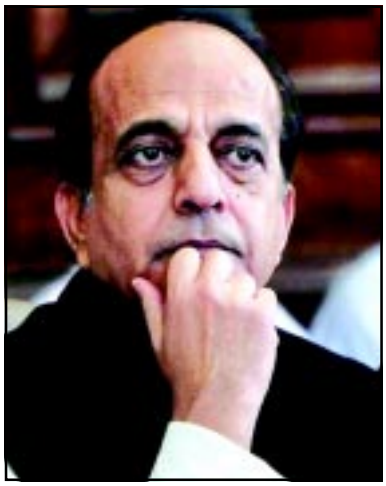

দীনেশের অপসারণের পিছনে মানি ব্যাগ?

নিশাকর সোম

জামিনে মুক্ত সিপিএমের প্রাক্তনমন্ত্রী ও বর্তমান বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ আদালতে উপস্থিত হলে তাঁকে চটি জুতা দেখানো হয়, বিধানসভায় তিনি বলতে উঠলে 'খুনি খুনি' ধ্বনি দিয়ে ধিক্কার দেওয়া হচ্ছে। হলদিয়ার অত্যাচারী মনসবদার লক্ষ্মণ শেঠ-কে সি আই ডি মুম্বাই থেকে গ্রেপ্তার করে এবং ভবানীভবনে জেরা চলছে। সি আই ডি-দের কাছে লক্ষ্মণ শেঠ অনেক তথ্য দেবেন এটাই স্বাভাবিক— কারণ তিনি অপরাধী করতে চাইবেন পার্টি নেতৃত্বকে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, জমি দখলের নোটিশ লক্ষ্মণ শেঠ বুদ্ধবাবুর সম্মতিতেই দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে চাপে পড়ে বুদ্ধবাবু মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বলেছিলেন, 'ওই নোটিশ ছিঁড়ে ফেলা হোক।' চমৎকার, একজন মুখ্যমন্ত্রী সরকারি নোটিশ ছিঁড়ে ফেলতে বলেছিলেন! এইরকম অপদার্থ— ক্যাজুয়াল রাজনীতিক বিরল। এই ব্যক্তি পার্টিকে বাঁচাবেন? অসম্ভব। পার্টিকে বরং আরও ডুবিয়ে দেবেন। এহেন ব্যক্তিকে প্রকাশ কারাত তোষামোদ করছেন। পার্টি-কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিগণ পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের তুলোধোনা করবেনই। পার্টির ভেতরে সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মী সদস্যগণ দীপক সরকার, সুশান্ত ঘোষ, লক্ষ্মণ শেঠকে বাদ দেওয়ার পক্ষে আছে। প্রসঙ্গত একটা মজার ঘটনা হলো, আজ যে-পত্রিকার মালিকপক্ষ তৃণমূলের মুখপত্র ও মুখপাত্রের ভূমিকা নিয়েছেন তাঁরাই একদা লক্ষ্মণ শেঠের পত্রিকা, নির্বাচনী পোস্টার ছেপে দেওয়া এবং লক্ষ্মণ শেঠকে নানা প্রকার সাহায্য করতেন!

আগামী ৪ এপ্রিল থেকে সিপিএম-এর ২০তম কংগ্রেস হবে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, রাশিয়ার কমিউনিস্টদের ২০তম পার্টি কংগ্রেসে স্তালিন অ্যান্ড কোং নিন্দিত হয়েছিল। সেই ইতিহাসের এবার পুনরাবৃত্তি ঘটবে কি? এতো গেল পরাজিত-বিধ্বস্ত শাসক গোষ্ঠীর অবস্থা।

অপরদিকে রাজ্যের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর অবস্থা দেখা যাক। রেলমন্ত্রী বদল নিয়ে এক নাটক হয়ে গেল। রেল-বাজেট পেশ করার পরই দীনেশ ত্রিবেদীকে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণের দাবি জানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। থুড়ি, ইনি আবার শুধুই 'মমতা' হিসাবে স্বাক্ষর করেন। এই ঘটনায় অছিলা হিসাবে রেলের যাত্রী ভাড়ার কথা প্রচার করা হয়েছিল। অথচ এই বাজেটের আগেই রেলের মাশুল বাড়ানো হয়েছিল। তার প্রতিবাদ মমতা করেননি। প্রধানমন্ত্রীকে মমতা আলটিমেটাম দিয়েছিলেন। ইউপিএ থেকে সমর্থন তোলার খবরও বাতাসে ছড়ানো হয়েছিল। দীনেশ ত্রিবেদী দ্রুত গতিতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে নিজের পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

দীনেশ ত্রিবেদী তাঁকে অপসারণ নিয়ে যে-সব কথা বলেছেন তাহলো--- এই অপসারণ পূর্ব-পরিকল্পিত। তিনি পদত্যাগের পূর্বমুহূর্তে একটি সংবাদপত্রকে ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমকে বলেছিলেন, 'তাঁর অপসারণের পেছনে টাকার খেলা আছে। তিনি আরও বলেছেন— 'আমাকে আমার পদ থেকে সরানোর পেছনে রেলের ভাড়া বৃদ্ধির কোনও কারণই নয়। আমার দল তৃণমূল কংগ্রেস রেলমন্ত্রীর পদ থেকে আমাকে সরাতে চাইছে। তার পেছনে ম্যানিব্যাগ বা টাকার লেনদেনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে আমার কাছে খবর আছে।' দীনেশবাবু বাজেট পেশ করার সময়ে বলেছিলেন, 'রেলকে আমি ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে বের করতে চাই।'

রেল দপ্তর টাকার খনি— এখানে যা হচ্ছে তার তদন্ত হওয়া দরকার। তবে প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেসের ক্লীব কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কিছুই করবেন না। কাদের টাকার থলির প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা? কেন দায়বদ্ধতা? এটা সততার প্রশ্ন। 'সততার প্রতীক' কি বলেন? দীনেশ ত্রিবেদী বলেছেন— 'আমার কাছে দেশ দলের ঊর্ধ্বে। বাজেটে যে রেলভাড়া বাড়ছে— তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক আমলা জানতেন। তিনিও বলেছিলেন, 'রেলের আর্থিক স্বাস্থ্যের যে হাল তাতে ভাড়া না বাড়লে রেলব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।' দীনেশবাবু আরও জানিয়েছেন যে, রেল বাজেট পেশ হওয়ার বহু আগেই দোলের দিন টিভি চ্যানেলে দীনেশের অপসারণ করার কথা প্রচার করা হয়। দীনেশ-এর বক্তব্য হলো— রেলমন্ত্রক প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে চলবে— রাইটার্স বিল্ডিং-এর অঙ্গুলিহেলনে চলবে না। আদতে ঘটনা কি এটাই যে দীনেশ ত্রিবেদী-কে 'কবজা' করতে ব্যর্থ হয়েই অপসারণ দাবি। তৃণমূলে কি হচ্ছে— সুমন কবীর বিরোধী। সাংসদ সুচারু হালদারকে কোণঠাসা করা হয়েছে। সৌগত রায় কোণঠাসা। সোমেন মিত্র নীরব কেন? রাজ্যসভার প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে তৃণমূলের নিচের তলার কর্মীরা সমালোচনায় মত্ত। নবতৃণমূল ও পুরানো তৃণমূলের দ্বন্দ্ব তো আছেই। পূর্ব কলকাতায় মন্ত্রী সাধন পাণ্ডেকে কোণঠাসা করার ব্যবস্থা করছেন এক বিধায়ক। তাঁকে মদত দিচ্ছেন তৃণমূলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশ। এই পূর্ব কলকাতাতেই তৃণমূলের একাংশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন? কলকাতার বিভিন্ন আবাসনে নাকি রাত্রিতে মস্তির আয়োজন চলছে? আবাসন দপ্তর তো তাঁদের পরামর্শ মেনেই চলছে বলে শোনা যায়। প্রদেশ কংগ্রেসে দুই নীতির অর্থাৎ তৃণমূলকে শিক্ষা দেওয়া এবং তৃণমূলের আনুগত্য মানা নিয়ে তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। রাজ্য তৃণমূল ধীরে ধীরে এ-রাজ্যের কংগ্রেস দলকে ভেঙে দিচ্ছে। কংগ্রেস রাজ্যসভার প্রার্থী দিয়েও প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। মন্ত্রী মানস ভুঁইয়াকে ইঙ্গিত করে কংগ্রেস বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'সাধু সাবধান! বুদ্ধদেবের মানসপুত্র, গৌতম দেবের চোখের মণি এই মন্ত্রিসভায় রয়েছে। সামনের বন্যাতে পশ্চিমবঙ্গ ডুবে যাবে। সেই ষড়যন্ত্র চলছে।' পরে নাকি তিনি এজন্য ক্ষমা চেয়েছেন। একেই বলে জুতো মেরে গোরু দান।

রাজ্যের দুই শিবিরের অবস্থা এইরকম। এর প্রতিফলন ঘটবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে। পঞ্চায়েত নির্বাচনেও কি হাঙ্গামা হবে না?

১৪ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফ আই আর দাবি

গত ২৫ মার্চ দিল্লীর যন্তর-মন্তরে সারাদিন ব্যাপী অনশনে আগামী আগস্টের মধ্যে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ১৪ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের না করলে দেশজুড়ে ফের আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিলেন আন্না হাজারে। অনশন মঞ্চে দুর্নীতিগ্রস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নাম এবং দুর্নীতি'র ফিরিস্তিও পেশ করেন তিনি। আন্নার অভিযোগের তালিকায় রয়েছেন— কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম (টু জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারী এবং তাঁর স্ত্রী-র কলকাতার ব্যবসায়ী ৫৮০ কোটি টাকা আয়কর ফাঁকি দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত কাশীনাথ তাপুরিয়ার পক্ষাবলম্বন করা), অজিত সিং (উইকিলিকসের দাবি অনুযায়ী ২০০৮-এ নিউক্লিয়ার চুক্তি আস্থা ভোটে ইউপিএ-এর পক্ষে ভোট কেনার জন্য প্রত্যেক সাংসদকে ১০ কোটি টাকার প্রস্তাব দেওয়ার মূল মস্তিষ্ক ইনিই), ফারুক আবদুল্লা (জম্মু-কাশ্মীর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের আর্থিক তছরূপ এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স কর্মী সৈয়দ ইউসুফ শাহ হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত), জি কে ভাসান (ক্যান্ডেলা বন্দরের নিকটবর্তী ১৬ একর জমি হাতিয়ে নেওয়ায় ২ লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব লোকসানের অভিযোগ), কমল নাথ (চাল রপ্তানী দুর্নীতি), কপিল সিবাল (রিলায়েন্সের ৬৫০ কোটি টাকার জরিমানা ৫ কোটিতে নামিয়ে দেওয়া), শরদ পাওয়ার (আব্দুল করিম তেলগী-র সঙ্গে 'যোগাযোগে'র প্রমাণ রয়েছে), শ্রীপ্রকাশ জয়সোয়াল (কয়লা দুর্নীতি-র অভিযোগ), সুশীলকুমার সিন্ধে ও বিলাসরাও দেশমুখ (দু'জনের বিরুদ্ধে আদর্শ আবাসন প্রকল্প কেলেঙ্কারী এবং এছাড়াও দেশমুখের বিরুদ্ধে জমি হাতিয়ে নেওয়ার জোরালো অভিযোগ রয়েছে), এম কে আজহাগিরি (রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর উদ্দেশ্য- প্রণোদিত আক্রমণ) বীরভদ্র সিং (ঘুষের পক্ষে প্রকাশ্যে সওয়াল), এস এম কৃষ্ণা (কর্ণাটক খনি কেলেঙ্কারী) এবং প্রফুল্ল প্যাটেল (কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী থাকার সময় অপ্রয়োজনীয় দামি এয়ারক্র্যাফট কেনা)।

রাজ্যের সীমা পরিবর্তন

ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্যগুলির সীমা কখনওই নির্দিষ্ট থাকছে না, মাঝে মধ্যেই তা পরিবর্তিত হচ্ছে। কারণ ভূমিক্ষয় এবং কখনও পলিসঞ্চয়। সার্ভে অব্ ইন্ডিয়ার প্রদত্ত তথ্যে উঠে এসেছে এমনই চমকপ্রদ তথ্য-পরিসংখ্যান। গত ১০ বছরে মধ্যপ্রদেশ, কেরল, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, দিল্লী-র আয়তন যেমন বর্গ কিমি অনুপাতে বেড়েছে, তেমনি অন্ধ্রপ্রদেশ, লাক্ষাদ্বীপ, নাগাল্যান্ড, পন্ডিচেরী, দমন দিউ এবং তামিলনাড়ুর আয়তন কমে গিয়েছে। তবে রাজ্যের আয়তন কমা-বাড়ায় সামগ্রিকভাবে দেশের আয়তন বৃদ্ধি-ই হয়েছে। ২০১১ সালের হিসেবে ভারতের বর্তমান আয়তন ৩২ লক্ষ ৮৭ হাজার ২৬১.৭১ বর্গ কিমি। ১০ বছর আগে অর্থাৎ ২০০১ সালে ভারতের আয়তন ছিল ৩২ লক্ষ ৮৭ হাজার ২৫২ বর্গ কিমি। ১৯৯১ সালের সমীক্ষায় ভারতের আয়তন ৩২ লক্ষ ৮৭ হাজার ২৬৩ বর্গ কিমি। বোঝাই যাচ্ছে, ১৯৯১ থেকে ২০০১ এই দশ বছরে গোটা দেশেই ব্যাপক ভূমিক্ষয় হয়েছিল।

প্রীতিলতা ও বীণাকে ৮০ বছর পর মরণোত্তর ডিগ্রি দান

স্বাধীনতাযুদ্ধের অবিস্মরণীয় শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও বীণা দাসকে মৃত্যুর ৮০ বছর পরে তাঁদের প্রাপ্য স্নাতক ডিগ্রী প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ শতকের তিরিশের দশকেই একদল বিপ্লবীকে নেতৃত্ব দিয়ে প্রীতিলতা চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাবে বোমা নিক্ষেপ করার দুঃসাহসী অভিযান চালান। প্রীতিলতা যে ১৯৩০ সালে কলকাতার বিখ্যাত বেথুন কলেজ থেকে দর্শনে সম্মানিক সহ সফলভাবে স্নাতক হয়েছিলেন তা স্বল্পপ্রচারিত। বীণা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তাঁকে ডিগ্রি প্রদানের দিনই গভর্ণর স্ট্যানলী জ্যাকসনের ওপর আক্রমণের ছক কষেছিলেন। ডিগ্রি আর তাঁর নেওয়া হয়নি, ঠিকানা হয়েছিল বৃটিশ জেল।

সংবাদে প্রকাশ, তৎকালীন ইংরেজ সরকার উভয়ের কাউকেই তাঁদের প্রাপ্য ডিগ্রি সম্মানপত্র দেওয়া থেকে বিরত থাকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে সম্প্রতি জানা গেছে বিপ্লবী চট্টগ্রাম পরিষদের কাছ থেকে তথ্য পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বর্তমান রাজ্যপালের নির্দেশে ওই ডিগ্রি দু'টি মরণোত্তরভাবে তাঁদের প্রদান করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য সুরঞ্জন দাস জানান দু' জনেরই পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিনিধির উপস্থিতির সম্ভাবনা ক্ষীণ হওয়ায় মাননীয় আচার্য রাজ্যপাল শ্রী এম কে নারায়ণনই এই শহীদ বীরাঙ্গনাদের তরফে ডিগ্রি গ্রহণ করে জাতির তরফে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানাবেন।

মাধব রক ব্যাণ্ড

মাধব শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম। সেই নামেই একটি গানের দল বা রক ব্যান্ড এখন গান গেয়ে সারা দেশের মন জয় করছে। এরা হরেকৃষ্ণ ৩২ অক্ষর নাম নিয়ে রিয়ালিটি শোতে হাজির। নির্দোষ সেবাতি গিটার বাজান এবং নম্রতা গান করেন। চণ্ডীগড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময়ে 'দ্য ইনোভেটিভস' নামে এক ব্যাণ্ড করেন। পরে চণ্ডীগড় ইসকন মন্দিরে গিয়ে তাঁদের মন পরিবর্তন হয়। এরা ব্যান্ডের নাম পরিবর্তন করে 'দি মাধবস সংকীর্তন রক ব্যাণ্ড' রাখেন। সঙ্গে পেয়ে যান নেহা বেহাল, গগনদীপ সিং, বরিন্দর পাল সিংকে। আধুনিক গানের চটক্‌দারিত্বকে বজায় রেখেও মাধব ব্যাণ্ড ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামগান করার মাধ্যমে সমস্যা থেকে উত্তোরণের উপায় প্রচার করতে থাকে।

সকামের রাজত্ব, বাম-রাজ্য ও রাম-রাজ্যের পার্থক্য

ডঃ স্বরূপ ঘোষ

রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীই পাথেয় কারণ বিবেক দর্শনেই আছে ভবিষ্যৎ ভারতের সামনে এগিয়ে যাবার মন্ত্র যা রাজনীতিকে ন্যায়নীতির পথে নিয়ে যাবে, তাকে অধ্যাত্মবাদে বলীয়ান করে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে সেবার ভাব জাগিয়ে তুলে। "মা দুর্গা" যে ভারতমাতারই রূপ তা অনুভবের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে শেখাবে স্বামীজীর স্বদেশমন্ত্র। স্বামীজী বলেছেন, "দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি।... গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা, শক্তিপূজা চালা।... এখন চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্য এবং স্বার্থগন্ধশূন্য শুদ্ধবুদ্ধি...।"

মানুষ একরাশ আশা নিয়ে ভোট দিতে যেত স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সূচনা লগ্নে। এখন যায় যেতে হয় বলে। কারণ যাদের মধ্যে থেকে নির্বাচন করতে হবে সে এক অতি দুরূহ কাজ। কারণ বিপুল সংখ্যক মানুষ জ্ঞাত যে একদিকে "Devil" অপরদিকে "Deep Blue Sea"। তাঁরা তাই তাঁদের ব্যাখ্যা মতো "Lesser Evil"-কে নির্বাচিত করে "Greater Evil"-কে প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে, আর শাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্রে "Evil" তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো বিরাজ করে আপন মহিমায়। তার আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই। এ শুধুই যাওয়া-আসা আর আশার স্রোতে ভাসা। তাই বিশ্বের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সরকার পরিবর্তন পালাবদল মাত্র। একপক্ষের নন্দী-ভৃঙ্গীর ভূতের নৃত্যের পর অন্যপক্ষের ভৈরববাহিনীর প্রেত নৃত্য। একরকম দেখতে দেখতে ক্লান্ত মানুষ একটু অন্যরকম দেখতে চান। সেটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। আর এই সত্যটিই সাধারণ মানুষকে বার বার ভোটের লাইনে দাঁড়াতে উৎসাহ দেয়। যে পালাবদল হলে, তা ঘনঘনই হোক আর মাঝে মধ্যেই হোক দৈত্যকে যেতে হবে এই ভয়টা যেন তার মধ্যে থাকে, সে তাহলে লাগামছাড়া হবে না। ভালো কিছু এরই মধ্যে হলে তা নিয়েই চলে সাতকাহন। শাসকের ভাষা ও বিরোধীর ভাষা দেশ কাল নির্বিশেষে দল-বল ব্যতিরেকে একরকম অপরিবর্তিত ও তার অন্তর্নিহিত অর্থগুলির ও ভাবসমূহের মধ্যে এক চিরকালীন মিল রয়েছে। একই দলের শাসক হিসাবে ব্যাখ্যা ও বিরোধী আসনে যখন থাকেন, তখনের ব্যাখ্যা মেলে না। কারণ যা বলেন তাতে বিশ্বাস করেন না, আর যাতে বিশ্বাস করেন ভয়ে তা বলতে পারেন না। স্বনামধন্য প্রচারমাধ্যম এর মধ্যে থেকেই রসদ খুঁজে বাজার বুঝে বাণিজ্য করে। সবাই যখন অর্থ চিন্তায় মগ্ন হয়ে কর্মক্ষেত্রে নেমেছে, যে সাংবাদিক বন্ধুটি দেশের আর দশজনকেই মনে রেখে মালিক যেমন বলছেন তেমন লিখছে কর্তার স্বার্থকে মেনে নিয়ে। তাই ভোট পর্যালোচনার সময় দেখবেন মালিক যে দলটিকে পছন্দ করে তার পক্ষে হাওয়া তোলার চেষ্টায় খবর তৈরি করা হয়। আর যখন ফল আশানুরূপ হয় না, দু-একদিন চুপচাপ থেকে মালিকের পছন্দমতো দল হারলে ভোট শতাংশের উপরে আর পছন্দের দল জিতলে আইনকক্ষে আসনের উপরে জোর দিয়ে নামী পত্রিকায় দামী সাংবাদিককে দিয়ে উত্তর সম্পাদকীয় লিখিয়ে নিয়ে, সংবাদকে পছন্দমতো দলের পক্ষে গুছিয়ে দিয়ে পরিবেশন। নিরাসক্ত সাধারণ মানুষকে নিরপেক্ষতার ভ্রমে ভ্রান্ত করে নিজ পক্ষে টেনে আনার অবিরাম প্রচেষ্টা— এই হলো বাজারী পত্রিকার একান্ত নিষ্ঠা। নিষ্কাম কর্মের শিক্ষাই ছিল ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের ভাবে। সাহেব চেয়েছিল ভারতবর্ষীয় সাহেব সংস্কৃতি মুগ্ধ মানুষ যেন সকাম কর্মকেই জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করে। সেই প্রচেষ্টায় একবার ভারতবর্ষের গুণী মানী ভদ্রজন মোহবদ্ধ হয়ে পড়লে দেশটাকে বিপথে নিয়ে যেতে শুধু সময়ের অপেক্ষামাত্র। সিদ্ধি ও সাধনার আগে যদি ঋদ্ধির আকুতিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায়, নারীশক্তিকে মাতৃভাবের মহিমান্বিত দেবীসত্তা থেকে মুক্ত করে পশ্চিমের ভোগবাদে উদ্বুদ্ধ করে স্বার্থান্বেষী করে তোলা হয়, সংসারের ভিতটাকেই তাহলে দুর্বল করে দেওয়া যাবে। ভারতবর্ষের ধর্মের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছেন 'মা', তাই মাতৃভাব মুক্ত ভারতবাসীকে সহজেই নিরীশ্বরবাদের দিকে টেনে আনা সহজ হবে। তাই বিদেশের ভাবে আত্মনিবেদিত সাহেবদের দর্শনে মুগ্ধ ভারতীয় নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনে সকামের রাজত্ব সিদ্ধ হলো। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী সেই ক্ষমতা হস্তান্তরের কূটচালের সম্পর্কে প্রথমে অজ্ঞাতই রইলেন। নেহরুর শপথ গ্রহণের দিনে গান্ধীজীকে সেই আনন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে দেখেছেন এমন ছবি কেউ দেখাতে পারবেন? চুক্তির স্বাধীনতাতে শাসনদণ্ড তাঁরই হাতে দেওয়া যায় যাঁর সঙ্গে চিন্তার জগতে সাদৃশ্য হয়েছে আর যাঁর প্রতি বিশ্বাস রয়েছে। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বিশ্বাস ছিল নেহরুর প্রতি, তাঁর জীবনদর্শনের প্রতি। গান্ধীজী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, সর্দার বল্লভভাই, ডঃ শ্যামাপ্রসাদে তাঁর সে বিশ্বাস ছিল কি? উত্তরটা সকলেরই জানা। আজও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নেহরুবংশকে অনেক ভাবে কাছের লোক মনে করেন। স্বাধীনতা উত্তরকালের ৬৪ বছরের মধ্যে ৫৪ বছর যে বংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতশাসন করে তারপর আজও ভারত বৃটিশ-মার্কিন অর্থনৈতিক ঋণজালে আবদ্ধ। বৈদেশিক ব্যাঙ্কে বেআইনী অর্থের বেশীরভাগই আছে আমেরিকায়। এসব ক্ষেত্রে ভারত দীনতায় আচ্ছন্ন হলেও বৃটিশ-মার্কিন শক্তির ক্ষতি হয়নি। অর্ধ-ভারতীয় অর্ধ-ইউরোপীয় বংশকে তাঁরা কাছের ভাববেন

সেটাই স্বাভাবিক। নেহরু-গান্ধী বংশের আড়ালে ফিরোজের বংশের শাসনে মধ্য-এশীয় দেশগুলিও নিশ্চিন্ত বোধ করবে এটাই পরম্পরা। সকামের রাজত্ব সাংস্কৃতিক দাসত্বকেও শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে সঙ্গে। সকামের স্বর্গভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'Recession' এসেছে লোভের হাত ধরে। সেদেশে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য বেড়েছে কালে কালে। এপথে ভারতের মুক্তি নেই সকলেই জানে কিন্তু স্বার্থসাধনে রত বুদ্ধিজীবীরা জেনেও চুপ থাকেন কারণ বৃটিশ-আমেরিকায় বৃত্তি পেয়ে পুরস্কার নিয়ে প্রচারের আলোয় থাকার লোভে। এসব জলাঞ্জলি দিয়ে স্বধর্মে স্থিত থাকার শিক্ষা নিতে তাঁরা রাজি নন। সকামের রাজত্বে সকলে শিক্ষা নিয়েছে অন্যের যাত্রাভঙ্গ করে নিজের যাত্রা প্রশস্ত করার রীতি জানতে, ফলে সমগ্র দেশটিই জতুগৃহে পরিণত হয়েছে। নিরাশায় নিমজ্জিত অধিকাংশ মানুষ।

গান্ধীজী জানতেন ত্যাগী মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চটির নাম সকামের সাধনায় রত স্বার্থান্বেষী শক্তি দুর্ব্যবহার করতে পারে। তাই স্বাধীনতা উত্তরকালে কংগ্রেসের মঞ্চটি ভেঙ্গে দিয়ে যে যাঁর মতো পথ নিয়ে চলুক নতুন ভাবে এটা তিনিই চেয়েছিলেন। বৃটিশ-মার্কিন স্নেহধন্য শাসককুল ও তাঁদের বিশ্বাসভাজন নেহরু বংশ দেখল তাহলে চলবে কি করে? কংগ্রেস(ই) পরবর্তী সময় যা এক পারিবারিক প্রতিষ্ঠান সেটি কবে আবার জাতীয় কংগ্রেস হলো কে জানে? 'হাত' চিহ্ন নিয়ে ভোটে লড়ত কংগ্রেস(ই)। ইতিহাসকে নিজের মতো করে ভ্রম সৃষ্টি না করলে সকাম রাজত্ব থাকে না, সেজন্য আমড়া যে আম নয় বলা যাবে না। এসকল বিচ্যুতি থেকে মানুষ ভাবলেন মুক্তি দেবে বাম রাজ্য। নাস্তিকতাকে সম্বল করে দেবভূমি ভারতবর্ষের প্রাণের সঙ্গে তাঁদের যোগসাধন হওয়া সম্ভব ছিল না। কয়েকটি রাজ্যে সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে একটি দেশে টিকে থাকতে গেলে নীতির চেয়ে তাঁরা দেশের প্রধান মধ্যপন্থী নিরীশ্বরবাদী নেহরুকেই কাছের মনে করেছে। কেন্দ্রে নেহরু বংশের প্রতিনিধি বিপদে পড়লেই ত্রাতার ভূমিকা নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে। পরিবর্তে দেশে বিদেশে শিক্ষা জগতের নামী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাবশালী পদ নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থায় নিরীশ্বরবাদের পথকেই প্রথম করে তুলেছে। মূল সংবিধান সংশোধন করিয়ে 'Secular' ও 'Socialist' দুটি শব্দ ঢুকিয়েছে। আর আমরা দেশের বৃহত্তম রাজ্যে সমাজবাদী পার্টির জয়ের বিশ্লেষণে কি দেখছি যে তাঁরা চল্লিশ শতাংশ ভোটও পায়নি, তারও বহু নীচে তাদের ভোট-শতাংশ। তাঁদের প্রতি তিনজন ভোটারের একজন মুসলমান আর একজন যাদব। অর্থাৎ 'MY' কোয়ালিশন। সেটিই প্রধান অবলম্বন। আর সমাজবাদী, মার্কসবাদী এসব হতে গেলে মার্কিন বিরোধী সুর থাকতেই হবে। তাই বিশ্বরাজনীতিতে দুই প্রবল শক্তি ইউরোডলার ও পেট্রোডলার-এর মালিকদের একসঙ্গে বিরোধিতা, অভিশাপ ডেকে আনতে পারে এক ক্ষুদ্র শক্তির উপর। তাই মুসলমান বিশ্বকে তুষ্ট রাখতেই হবে। অতীতের ত্যাগী বামপন্থী মানুষজন চলে গেছেন, রইলেন যাঁরা তাঁরা কামনা-বাসনার ত্যাগ নয়--- ভোগে বিশ্বাসী। একদিকে সমাজবাদী একইসঙ্গে পরিবারবাদ, মুখে মার্কসবাদী, জীবনযাত্রার কোথায় তার ছাপ? সংসদীয় গণতন্ত্র, প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে এঁরা যখন মঞ্চ গরম করেন মনে হাসি পায় এই দেখে যে মন-মুখ এক নয়। দু-রকম চলছে। স্বৈরাচার, দুরাচার, দলদাসতন্ত্র এঁদের শাসনকালে কিছু কম হয়নি। এদেশের মার্কসবাদীরা পাকিস্তানেরও সমর্থক ছিল। সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করেছিলেন। সমাজবাদী পার্টির অনেক দাবীই মিলে যায় মুসলীম লীগের দাবীর সঙ্গে। এটাই বাস্তব। এই স্ববিরোধ থেকে নির্গমনের পথই বলেছেন স্বামী বিবেকান্দ তাঁর অধ্যাত্মবাদে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম তার উদার মানবিকতাবাদকে স্বীকার করে, সমাজবাদের মধ্যে দিয়ে শূদ্র জাগরণের ভাবকে গ্রহণ করে বেদান্তের আলোকে তাকে জারিত করে তিনি ভারতবর্ষকে দিয়ে গেছেন বৈদান্তিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব। লোভকে জয় করে ভোগকে নিয়ন্ত্রণে রেখে অন্তরের স্থিতির সঙ্গে বাইরের গতিকে মিলিয়ে নিয়ে চলার পথ দেখিয়েছেন তিনি। ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনে লড়েছিল রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে, সকামের রাজত্ব বা বাম রাজ্য গঠনের জন্য নয়। পশ্চিমের মুক্তভাব যুক্ত হবে ভারতের সনাতন শুদ্ধভাবের সঙ্গে। রামরাজ্যে সেটাই হবে লক্ষ্য। কিন্তু যাঁরা রামরাজ্যের দর্শনটাই ভুলিয়ে দিতে চাইছেন তাঁরা ভারতবর্ষের প্রাণের সাধনাকেই অস্বীকার করতে চাইছেন। রামরাজ্যের স্বপ্নের কাণ্ডারীদের, পশ্চিমের মানবতাবাদীদের সঙ্গে পূর্বের সনাতন দর্শনের ভাবের আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে মেলবন্ধনের সূত্রে রচনায় ব্রতী হতে হবে দাসের মনোবৃত্তি নিয়ে, নয় সাধুর মনোভাবকে সামনে রেখে। দেশের কাণ্ডারীকে প্রান্তিক মানুষের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হতে গেলে তাঁদের মতো থাকতে জানতে হবে, তবেই তাঁদের দুঃখের কথা বোঝাতে পারা সহজ হবে। আমাদের দেশে রাজসন্ন্যাসীর দর্শন রয়েছে রাজনীতি যতদিন অধ্যাত্মবাদকে গ্রহণ করতে পারবে না ততদিন তার স্বার্থপরতাপূর্ণভাব যাবেও না। রামরাজ্য রাজসন্ন্যাসীর ভাবকে গ্রহণ করে যা পরের মধ্যে নিজেকে ও নিজের মধ্যে সেবক ভাবের ত্যাগের ব্রতকে জাগ্রত করার পথ দেখায়। ত্যাগ ও সেবার মন্ত্রকে অধ্যাত্মবাদই সাধনার মাধ্যমে গ্রহণ করে। সে পথই দেখিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সঙ্ঘের চতুর্থ সঙ্ঘগুরু স্বামী অখণ্ডানন্দের মধ্যে সেই দেশভক্তির প্রকাশ দেখেছিলেন অনেক দেশভক্তজন। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে প্রকৃত রাষ্ট্রবাদীরা এগিয়েছিলেন দেশ সেবায়। সুভাষচন্দ্রের প্রেরণা ছিলেন বিবেকানন্দ। বালগঙ্গাধর তিলক অনুপ্রাণিত হতেন স্বামীজীর লেখা পড়ে। গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জানিয়েছিলেন শ্রদ্ধাঞ্জলি। শ্রীঅরবিন্দ অধ্যাত্মবাদের পথে এগিয়েছিলেন স্বামীজীর 'রাজযোগ' পড়ে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ তাঁর রাষ্ট্রবাদের প্রেরণা পেয়েছিলেন স্বামীজীর কাছ থেকে। রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীই পাথেয় কারণ বিবেক দর্শনেই আছে ভবিষ্যৎ ভারতের সামনে এগিয়ে যাবার মন্ত্র যা রাজনীতিকে ন্যায়নীতির পথে নিয়ে যাবে, তাকে অধ্যাত্মবাদে বলীয়ান করে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে সেবার ভাব জাগিয়ে তুলে। "মা দুর্গা" যে ভারতমাতারই রূপ তা অনুভবের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে শেখাবে স্বামীজীর স্বদেশমন্ত্র। স্বামীজী বলেছেন, "দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি।... গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা, শক্তিপূজা চালা।... এখন চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্য এবং স্বার্থগন্ধশূন্য শুদ্ধবুদ্ধি...।"

মতাদর্শের সঙ্কটে কম্যুনিস্টরা

অতিথি কলম

বলবীর কে পুঞ্জ

যীশু খৃস্টকে বিশ্বের মানুষ অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু ও মানবপ্রেমিক হিসেবে জানলেও তিনি যে কার্ল মার্কস বা ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের সমগোত্রীয় এক 'আগুনখোর বিপ্লবী' ছিলেন তা কেরলের মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের সাম্প্রতিক মূল্যায়ন থেকে টাটকা বেরিয়ে এসেছে। অন্তত তিরুবনন্তপুরমে সদ্য সমাপ্ত সিপিএম রাজ্য কমিটির সম্মেলনে আয়োজিত একটি প্রদর্শনীর মহাআড়ম্বরে তথাকথিত ধর্মীয় পরিত্রাতা যীশুর প্রদর্শিত বিশাল ছবিগুলির দিকে তাকালে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। সম্মেলনে 'বিপ্লবীদের কক্ষ' নামাঙ্কিত একটি সংরক্ষিত স্থানে দু'টি ছবি বিশেষ মর্যাদায় শোভা পাচ্ছিল। একটি ক্রুশবিদ্ধ যীশু, অপরটি লিওনার্দো দা ভিঞ্চির বিশ্বখ্যাত মূল ছবির কুশীলবদের একটু পালটে নিয়ে 'দি লাস্ট সাপার' (শেষ নৈশভোজ)। শেষোক্ত ছবিটিতে সপার্ষদ যীশুর জায়গায় উর্বরমস্তিষ্কের মার্কসবাদীরা প্রেসিডেন্ট ওবামার মুখ বসিয়ে লাস্ট সাপার অর্থে সাঙ্কেতিক ভাবে 'ক্যাপিটালিজমের' মৃত্যু বোঝাবার মোটামুটি চেষ্টা করেছেন।

বিখ্যাত ইতালীয়ান শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি-র যীশুর 'শেষ নৈশভোজ' অনুকরণে আঁকা 'দি লাস্ট সাপার'-এর ব্যঙ্গচিত্র সি পি এমের কেরল রাজ্য সম্মেলনে। ভিঞ্চির সেই ছবির পাল্টে যাওয়া কুশীলবদের মধ্যে এখানে রয়েছেন সোনিয়া-মনমোহন-রাহুল-আদবানি-নরেন্দ্র মোদীরা। তবে মধ্যমণি অবশ্যই বারাক ওবামা।

যাইহোক, কেরল থেকে পাওয়া সংবাদ অনুযায়ী নাস্তিক মার্কসবাদীদের খৃস্টীয় ধর্মগুরুর প্রতি উথলে ওঠা এই শ্রদ্ধা-ধর্মের প্রতি হঠাৎ গজানো কোনও টান থেকে নয়। আসল কারণ রাজনৈতিক কৌশল। উল্লেখ্য, ২০১১ সালে এরাজ্যে চলতি ইউ ডি এফ (কংগ্রেস পরিচালিত) জোটের কাছে অতি সামান্য ব্যবধান ক্ষমতা হারিয়েছে সিপিএম (এল ডি এফ)। এদিকে রাজ্যে এমন একটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হওয়ার সুযোগ এসেছে যেটির ফলাফলে ক্ষমতা ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। আবার এই কেন্দ্রটি ব্যাপকভাবে খৃস্টান অধ্যুষিত হওয়ায় পার্টি আদাজল খেয়ে পাদ্রীদের তৈলমর্দনে লেগে পড়েছে। আসন্ন উপনির্বাচনে কেন্দ্রটির ভাগ্য বহুলাংশেই খৃস্টান নির্ভর হওয়ায় রাজ্যের ছোট বড় যা কিছু খৃস্টীয় সংগঠন আছে, পার্টি সবাইকেই হাত কচলে চলেছে।

> **নাস্তিক মার্কসবাদীদের খৃস্টীয় ধর্মগুরুর প্রতি উথলে ওঠা এই শ্রদ্ধা—ধর্মের প্রতি হঠাৎ গজানো কোনও টান থেকে নয়। আসল কারণ রাজনৈতিক কৌশল।**

প্রসঙ্গত, মার্কসবাদীদের সঙ্গে চার্চের কর্তাদের সম্পর্ক কোনওকালেই মধুর নয়। ক্ষমতায় থাকাকালীন চার্চের আওতায় থাকা অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনভার কব্জা করতে দল নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যায়। পক্ষান্তরে চার্চ অধিকর্তারাও বরাবর তাদের নাক গলানো আটকাতে বদ্ধপরিকর।

এল ডি এফ এবং ইউ ডি এফ কেরলে গত ২০ বছর ধরে পালা করে ক্ষমতা ভোগ করে আসছে। সদ্য ২০১১ সালে বামপন্থীরা ক্ষমতা হারিয়েছে। রাজ্যের জনসংখ্যায় খৃস্টানদের অনুপাত শতকরা ২১ ভাগ হওয়ায় কোনও রাজনৈতিক দলই এই বিপুল সংখ্যাকে এড়িয়ে চলতে পারে না। মধ্য কেরলের ক্ষেত্রে এটা আবার বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ভয়ের কথা উপনির্বাচনটি এই মধ্য কেরলের একটি কেন্দ্রেই হবে।

এই প্রসঙ্গে মার্কসবাদীরা যদি ভেবে থাকেন যীশুখৃস্টকে বিপ্লবী বানাবার এই কৌশলেই বাজিমাত করবেন তাহলে সে গুড়ে বালি। ছোট বড় সমস্ত চার্চের কর্তাব্যক্তিরাই মার্কসবাদীদের খৃস্টধর্মের অবতার যীশুকে নিয়ে এই বিপ্লবী বিপ্লবী খেলাটা মোটেই ভাল চোখে দেখছেন না। বিশেষ করে তাঁরা খুব ভালই জানেন বুনিয়াদী

স্তরে মার্কসবাদীরা ধর্মের প্রতি জন্মঘৃণা পোষণ করে। মার্কস তো ধর্মকে 'জনতার আফিম' আখ্যা দিয়ে তীব্র বিতৃষ্ণায় মার্কসবাদের শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব প্রচলন করেন। চিরকাল কথা ঘুরিয়ে বলে লোককে বোকা বানাতে ওস্তাদ, দলের সম্পাদক প্রকাশ কারাট রাজ্য সম্মেলনে তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, সিপিএম কখনওই সঙ্ঘবদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে চায়নি। কারাটের বক্তব্য 'সত্যি কথা বলতে কী, আমার দল বরাবরই যীশু খৃস্ট ও খৃস্ট ধর্মের ওপর শ্রদ্ধাশীল। আদতে খৃস্টান মতের সঙ্গে মার্কসবাদের যা মিল আছে পুঁজিবাদের সঙ্গে তা নেই"— কথাক'টি কিউবার একনায়ক ফিদেল কাস্ত্রোকে উদ্ধৃত করে জানান কারাট।

ন্যূনতম ব্যবধানে কেরলে সদ্য ক্ষমতা হারানো সিপিএম দল এখন অনেকটা পাগলপ্রায়। নিজেদের মধ্যে প্রবল মতভেদে ও বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত, তা রাজ্য সম্মেলনে প্রকট হয়ে উঠেছে। মজার কথা, দেশের অপর ক্ষীয়মান কম্যুনিস্ট সিপিআই দলটিও গাজোয়ারি করে প্রায় একই সময়ে মাত্র ৬০ মাইল দূরেই তাদেরও রাজ্য সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। সিপিআই-এর রাজ্য সম্পাদক চন্দ্রাপ্পন তাঁর সহোদর ভাইকে বিদ্রুপ করে বলেছেন, লিওনার্দো ডা ভিঞ্চির ছবি বিকৃতভাবে ব্যবহার করে সিপিএম সম্মেলনটিকে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানে পরিণত করেছে।

ঠিক পশ্চিমবঙ্গের মতোই কেরলেও সম্মেলনের প্রতিনিধিবৃন্দ দলের হারের কারণের চুলচেরা বিশ্লেষণের বদলে নিজের দলের নেতৃবৃন্দের, বিশেষ করে ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুতানন্দের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরতেই মশগুল ছিলেন। যেটুকু দলগত পর্যালোচনা দেখা গিয়েছিল তার সবটাই মূলত রাজ্য সম্পাদক বিজয়ন গোষ্ঠীর তরফ থেকেই। বিজয়ন বাহিনী জোর কদমে অচ্যুতানন্দনের পেছনে পড়ে যান। এমনকী তাঁরা ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রীকে দলের শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বামফ্রন্টকে দুর্বল করে দেবার অপবাদ পর্যন্ত দিতে ছাড়েনি। প্রকৃতপক্ষে বিজয়ন বাহিনী সিপিএম ক্ষমতায় থাকাকালীনই অচ্যুতানন্দনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শাণিয়ে চলেছিল। অবশ্য কেউই কম যান না— দু'জনের বিরুদ্ধেই অপরাধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করার মতো দুর্নীতির অভিযোগও রয়েছে।

ইউ ডি এফ ক্ষমতায় আসার পর অচ্যুতানন্দনের বিরুদ্ধে নিকট আত্মীয়কে প্রভাব খাটিয়ে সরকারি জমি পাইয়ে দেওয়া সংক্রান্ত একটি ভিজিল্যান্স রিপোর্ট জোগাড় করেছে। এর আগে দলীয় মুখপত্র 'দেশাভিমানী'তে অচ্যুতানন্দনের বিরুদ্ধগোষ্ঠী মাফিয়া গ্যাঙের কাছ থেকে ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রীর ২ কোটি টাকা নেওয়ার মতো মারাত্মক অভিযোগ প্রকাশ্যে এনেছে। ব্যাপারটা নিয়ে শোরগোল পড়ে গেলে পার্টির তরফে ধামাচাপা দিতে 'টাকাটা একটা বিজ্ঞাপন বাবদ নেওয়ার কথা ছিল তা ইতিমধ্যে ফেরতও দিয়ে দেওয়া হয়' এমন কাহিনীই শোনানো হয়েছে।

যাইহোক, চার্চের দরজায় হামলে পড়ার ব্যাপারটা সিপিএমের ক্ষেত্রে নতুন কিছু নয়। অতীতেও তারা এ কৌশল নিয়েছে। কেরলের রাজনীতির তথ্যাভিজ্ঞ মহলের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ১৯৮৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস (ইউ ডি এফ)-এর পরাজয়ের মূলে ছিল স্থানীয় খৃস্টান চার্চগুলির কর্তাদের সঙ্গে পার্টির গোপন বোঝাপড়া।

প্রকাশ কারাট যতই হম্বিতম্বি করে বলুন না কেন, তাঁর দল সর্বদাই ধর্মীয় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে। অথচ বাস্তব হলো পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে এই দুটি রাজ্যেই তারা মুসলিম মৌলবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। কেরলে ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বহু দেশবিরোধী ও হিংসাত্মক চক্রান্তে লিপ্ত থাকা বর্তমানে জেলবন্দী আবদুল নাসের মাদানীর দলের সঙ্গে দল নির্বাচনী সমঝোতা করেছিল। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই মাদানী তাঁর দল গড়েছিলেন। তাই আকাশ থেকে পড়ার কিছু নেই। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তারা আজন্ম বিরোধী এমন প্রচারের ঢক্কানিনাদ চালিয়ে গেলেও ক্ষমতা হাসিল করতে মৌলবাদীদের সঙ্গে যে কোনও আঁতাত করতে সিপিএমের জুড়ি নেই। তাই বিশ্বখ্যাত বিপ্লবী বা শহীদদের ছবির সঙ্গে যীশুর ফটো একসঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়ার যে ব্যাখ্যাই দলের মাতব্বররা দিননা কেন, দল এসব মতলবে সিদ্ধহস্ত। শুধু মনে হয় কমরেড, জনতার দরবারে বহুপূজিত প্রভু শ্রীরামের জয়গান করলেই কেউ রাতারাতি 'চরম সাম্প্রদায়িক' বনে যায় কোন যুক্তিবলে?

(লেখক একজন বিশিষ্ট স্তম্ভ লেখক)

এদেশের কমিউনিস্টরা ভারতীয় হতে রাজি নন

নিশাকর সোম

চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে জানা গেছে যে 'জিন'-এর প্রভাবের ফল থাকে পরবর্তী প্রজন্মের উপর। ভারতের কমিউনিস্টদেরও সেই 'জিন'-এর প্রভাব থেকে গেছিল শুরু থেকেই। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তাসখন্ডে ১৭ অক্টোবর, ১৯২০ সালে স্থাপিত হয়। এই পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ ছিলেন এম এন রায়, এভিলিন ট্রেন্ট রায় (এম এন রায়ের পত্নী), অবনী মুখার্জি, রোজা ফিটিং (অবনী মুখার্জির পত্নী), মহম্মদ আলি (আহমেদ হোসেন), মহম্মদ শাফিক সিদ্দিকি এবং এম. পি. বি. টি. আচার্য।

এম. এন. রায় অখণ্ড বাংলার যুগান্তর এবং অনুশীলন গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করে কমিউনিস্ট পার্টির গড়ার উদ্যোগ নেন। বস্তুত ছোট ছোট কমিউনিস্ট গ্রুপ বিভিন্ন রাজ্যে ছিল। অবিভক্ত বাংলাদেশে মুজাফ্ফর আহমেদ-এর গোষ্ঠী, বোম্বাইতে এস-এ-ডাঙ্গের গোষ্ঠী, মাদ্রাজে সিঙ্গায়াভেলু চেট্টিয়ার গোষ্ঠী, উত্তরপ্রদেশে শউকত উসমানির গোষ্ঠী এবং পাঞ্জাবে গোলাম হোসেন গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল।

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ১৯২১ থেকে ১৯২৪-এর মধ্যে চারটি ষড়যন্ত্রের মামলা হয়। ১৭ মার্চ, ১৯২৪ সালে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা সহ চারটি ষড়যন্ত্র মামলা চলেছিল— (১) পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা, (২) পেশোয়ার মামলা, (৩) মস্কো ষড়যন্ত্র মামলা এবং (৪) কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা। এইসব ষড়যন্ত্রের মামলার প্রচার সংবাদসংস্থা করেছিল। ফলে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল। এই সমস্ত মামলার মাধ্যমে এটা প্রচারিত হয়েছিল যে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যালের মতবাদ ও লক্ষ্য প্রচারে এই কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলি সক্রিয় ছিল। কানপুর বলশেভিক মামলার আটক বন্দীদের মধ্যে সিঙ্গায়াভেলু চেট্টিয়ার অসুস্থতার কারণে মুক্তি পান। এম. এন. রায় জার্মানীতে থাকার জন্য গ্রেপ্তার হননি। আর সি শর্মা ফরাসি অধিকৃত পণ্ডিচেরীতে থাকার জন্য গ্রেফতার হননি। গুলাম হোসেন স্বীকারোক্তি দিয়ে বলেছিলেন, তিনি কাবুলে রাশিয়ার কাছ থেকে অর্থ পেয়েছিলেন। তাঁকে বৃটিশ সরকার ক্ষমা করে দেয়, মুজাফ্ফর আহমেদ, ডাঙ্গে এবং নলিনী গুপ্ত কারারুদ্ধ হন। ডাঙ্গে ১৯২৭ সালে সর্বপ্রথম মুক্তি পান।

১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর কানপুরে একটি কমিউনিস্ট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে আনুমানিক ৫০০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলন-এর আহ্বায়ক ছিলেন সত্যভক্ত। কানপুর সম্মেলনে সত্যভক্ত 'জাতীয় কমিউনিজম'-এর তত্ত্ব হাজির করেন এবং তিনি কমিটার্ন-এর অধীনতা মানতে চাননি। সত্যভক্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি নামের পক্ষে সওয়াল করেন। এই সম্মেলন থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ সিপিআই গঠিত হয়।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ৬ষ্ঠ সম্মেলন ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন-এর প্রস্তাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের জাতীয় সংস্কারবাদী মুখোশ খুলে ধরার নির্দেশ দেওয়া হয়। একইসঙ্গে এটাও বলা হয়েছিল যে ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়াদের (ধনিকশ্রেণী) সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্য-এর দ্বন্দ্বের সুযোগ নিতে হবে। ১৯২৯ সালে ৩ থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের এক্সিকিউটিভ কমিটির সভা থেকেই ভারতীয় কমিউনিস্টদের প্রতি নির্দেশ জারি করা শুরু হয়। ১৯২৮ সালে মস্কোতে ইউনিভার্সিটি অফ টয়লারস অফ ইস্ট-এ বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্তালিন বলেছিলেন— ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর একাংশ নিজেদের টাকার থলিকে বাঁচানোর জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করেছে।

প্রসঙ্গত এখানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন প্রয়াত কাউন্সিলার সামশুল হুদা।

১৯২৯ সালে ২০ মার্চ কমিউনিস্ট, ওয়াকার্স পেজেন্টস পার্টি এবং অন্যান্য শ্রমিকনেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। 'মীরাট ষড়যন্ত্র' মামলা শুরু হয়। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা থেকে কমিউনিস্ট নেতাদের মুক্তির পর ১৯৩৩ সালে কমিউনিস্টরা পুনর্গঠিত হলো এবং ১৯৩৪ সালে পার্টির একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। ইতিপূর্বেই পি সুন্দরাইয়ার নেতৃত্বে অন্ধ্র এবং তামিল ছাত্রদের একটি অংশকে আমির হায়কর খান কমিউনিস্ট পার্টিতে নিয়ে আসেন। ১৯৩৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি সিদ্ধান্ত নেয় যে, এই পার্টি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ভারতীয় সেকশন হবে। শুরু হলো বিদেশী নেতাদের নির্দেশে এদেশের কমিউনিস্টদের যাত্রা।

কমিন্টার্ন 'পপুলার ফ্রন্ট নীতি' ঘোষণা করলে ভারতীয় কমিউনিস্টদের জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে নীতি পরিবর্তন হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৪০ সালে রামগড় কংগ্রেস সম্মেলনের

পি সি যোশী

এস এ ডাঙ্গে

এস এ ডাঙ্গে 'ইন্ডিয়া ফ্রম প্রিমিটিভ কমিউনিজম টু স্লেভারি' নামে একটি পুস্তক রচনা করে ভারতীয় উপনিষদ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ ও মহাকাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে ভারতে বহু প্রাচীনকালেই আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা ছিল। যদিও সিপিআই এই পুস্তক-কে নিষিদ্ধ করে এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীকালে ডাঙ্গের জামাতা বাণী দেশপান্ডেও ডাঙ্গের পথে হেঁটে ছিলেন। তাঁর একটি নিবন্ধ 'স্বস্তিকা'তে প্রকাশিতও হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে কমিউনিস্টরা 'প্রলেটেরিয়ান পাথ' নামে একটা ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। এই ঘোষণায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশদের বিরুদ্ধে সাধারণ ধর্মঘট, কর দেব না, কোনও সহযোগিতা করা হবে না— বলা হয়েছিল।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে বৃটিশ-আমেরিকার সঙ্গে মৈত্রীশক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের কমিউনিস্টরা 'জনযুদ্ধের' নীতি ঘোষণা করে— 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনেরও বিরোধিতা করে। ১৯৪২ সালে জুলাই মাসে সিপিআই-কে বেআইনি করা হয়। তদানীন্তন পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশী ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েলকে পত্র দিয়ে জানান যে তাঁরা ৪২'-এর আন্দোলনের বিরোধী, প্রয়োজনে ৪২'-এর বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারে সাহায্য করবে। এর পরবর্তীকালে বিলাতে শিক্ষারত একদল ভারতীয় ছাত্র বৃটিশ কমিউনিস্ট নেতা রজনীপাম দত্ত-এর দ্বারা কমিউনিস্ট ভাবধারায় প্রভাবিত হন এবং তাঁরা ভারতে ফিরে সিপিআই-তে যোগ দেন। তখন থেকেই সিপিআই-এর পলিটিক্যাল মনিটর হন রজনীপাম দত্ত।

এদেশের কমিউনিস্টরা নিজেদের মস্তিষ্ককে বিদেশী অভিভাবকদের কাছে মোটামুটি বন্ধক রেখে চলেছে। শুধু যে ১৯৪২-এর রাশিয়ার নির্দেশে জনযুদ্ধের তত্ত্ব খাড়া করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করার কাজ করেছিল তাই নয়, কলকাতায় মহম্মদ আলি পার্কে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে রণদিভে-লাইন গৃহীত হবার পর শহরের পার্টিজান ওয়ারফেয়ার-এর নীতি নিয়ে কমিউনিস্টরা ধ্বংসের কাজে নিযুক্ত হয়। এর পরবর্তীকালে ১৯৫০ সালে এই নীতির ব্যর্থতা প্রকট হলে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির তিনজন প্রতিনিধি অজয় ঘোষ, ডাঙ্গে এবং দামোদর মেনন মস্কোয় পরামর্শ করার জন্য যাবার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। তখন কংগ্রেস নেত্রী সরোজিনী নাইডুর পুত্র জয়সূর্য নাইডু এবং ভ্রাতা হারীন চ্যাটার্জী মারফৎ নেহরুর সহযোগিতায় এই তিন প্রতিনিধি মস্কোয় যান এবং রুশ দেশের ভারত তত্ত্ববিদ বালাভুশেভিচ, ডায়াকভ সহ স্তালিনের সঙ্গে আলোচনা করেন। সেখান থেকে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৫১ সালের দলীয় কর্মসূচী এবং স্টেটমেন্ট অফ পলিসি তৈরি হয়। এই প্রস্তুতিতে স্তালিনের প্রত্যক্ষ পরামর্শ ছিল।

এখানে একটি মজার ঘটনার ঘটেছিল। তা হলো, রুশ নেতারা ভারত বিভাগের জন্য র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী ভারত বিভাগের সীমারেখা নির্দেশ করতে বলায়, ভারতের কমিউনিস্ট প্রতিনিধি হতভম্ব হয়ে যান। তখন নাকি রুশ নেতা স্তালিন সেই সীমারেখা ভারতের মানচিত্রে দাগ দিয়ে দেন। কমিউনিস্টদের মস্তিষ্ক বন্ধক রাখার এটাই ফল।

একমাত্র এস এ ডাঙ্গে 'ইন্ডিয়া ফ্রম প্রিমিটিভ কমিউনিজম টু স্লেভারি' নামে একটি পুস্তক রচনা করে ভারতীয় উপনিষদ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ ও মহাকাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে ভারতে বহু প্রাচীনকালেই আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা ছিল। যদিও সিপিআই এই পুস্তক-কে নিষিদ্ধ করে এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীকালে ডাঙ্গের জামাতা বাণী দেশপান্ডেও ডাঙ্গের পথে হেঁটে ছিলেন। তাঁর একটি নিবন্ধ 'স্বস্তিকা'তে প্রকাশিতও হয়েছিল।

সিপিআই পার্টিতে ভাঙন হওয়ার পর সিপিএম দল গড়ার কংগ্রেস (৭ম পার্টি কংগ্রেস)-এ চীন এবং রাশিয়ার নীতির অন্ধ অনুকরণ থেকে দূরে সরে নিজস্ব বিশ্লেষণে ভারতীয় বিপ্লবের নক্‌শা করতে চেয়েছিল।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যালের সেকশন হিসাবে কাজ করতে চেয়েছিলেন সিপিআই নেতারা। কারণ— (১) সার্বিক সাহায্য (২) রাজনৈতিক সাহায্য, (৩) রাশিয়া থেকে বিনা পয়সায় বই আসবে তা বিক্রি করে অর্থ জমান।

নকশালপন্থীরাও চীনের আর্থিক-রাজনৈতিক সাহায্য পেয়েছিল। নেপালে গিয়ে চীনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন কলকাতার একদল ছাত্র-নেতা। নকশালরা স্লোগান দিয়েছিল--- 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান।' শোনা যায় পরবর্তীতে সৌরিন বসু যখন চীনে গিয়েছিলেন, তখন চীনের নেতারা এই স্লোগান দেওয়াকে নিন্দা করেছিল।

সিপিএমের আজও নাবালকত্ব যায়নি। তাই আদর্শগত দলিলে কিউবাকে অবলম্বন করার কথা বলা হচ্ছে। ভারতের ইতিহাস এবং পরম্পরা অধ্যয়ন করা এবং বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নেই। এখন তো যা হয় তা শুধু নির্বাচন জেতার জন্য কৌশলী পদক্ষেপ।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কখনওই কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যালের হুকুমে চলেনি। তিনবার তাদের পরামর্শ মাও যে দং প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৪২ সালের ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারত-ছাড়ো আন্দোলনকে বঙ্কিম মুখার্জি এবং এস এ ডাঙ্গে সমর্থন করে নিন্দিত হয়েছিলেন। ডাঙ্গে সুভাষ বসুর দেশত্যাগে সাহায্য করার জন্য তাঁর বন্ধুদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। যাইহোক, সিপিআই-সিপিএম দু' দলই এখনও পরস্মৈপদী— তারা ভারতীয় কমিউনিস্ট হতে পারল না।

বামেদের ভারতীয়ত্বে ফেরার তাগিদ

সুমিত চক্রবর্তী

প্রসঙ্গ : সিপিএম বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের জামিন। 'সুশান্ত ঘোষ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুশান্তবাবুকে ফাঁসিয়ে দিয়েছেন। এটাকে নির্লজ্জ দলতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আমার বহু নেতা-কর্মীকে এভাবেই মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সুশান্ত ঘোষ জামিন পাওয়ার পর যে সংবর্ধনা পেয়েছেন সেটা স্বতঃস্ফূর্ত।'—ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এস এফ আই-এর নেতা। 'সিপিএমের একজন নেতা জামিন পেলেন, এটা তো ওদের দলের কর্মীদের মধ্যে একটা উদ্দীপনা তৈরি করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। ওঁর পরিবারও এতে খুশি। এটা তো ঠিকই যে বামপন্থীদের ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর পরেও যদি প্রমাণ হয় যে সুশান্ত ঘোষ দোষী তা হলে তাঁর শাস্তি হবে। আর সাক্ষী-সাবুদ না পাওয়া গেলে তিনি ছাড়া পাবেন।' —হাফিজ আলম সাইরাণী, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা।

সিপিএমের সংস্কৃতিটাই তো এরকম। এই দলে যারা যত খুন করবেন, তাঁরাই তত সম্মান পাবেন। এত কঙ্কাল কিভাবে বেরোচ্ছে? এটা তো আট মাসে হয়নি। চৌত্রিশ বছর ধরে এটা হয়েছে। কথাটা সিপিএমের মনে রাখা উচিত।' —কৃষ্ণা দেবনাথ, প্রদেশ কংগ্রেস নেত্রী।

এই তিনটি দলের নেতা-নেত্রীর কথা আমরা পৌঁছে দিলাম জনগণের কাছে। এই কথার সপক্ষে এবং বিপক্ষে মন্তব্য করার অধিকার রয়েছে একমাত্র তাঁদেরই। মন্তব্যগুলি শোনার পর জনতার মনেও কিছু প্রশ্ন জেগে উঠছে। প্রথমত, আজ সিপিএম যে দলতন্ত্রের কথা বলছে তা কী তাঁদের রাজত্বকালে কায়েম হয়নি? তাঁরা কি সবক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হতে পেরেছিলেন? যদি তাই হয়, তাহলে এখন কেন প্রায় প্রতিটি দলীয় সমাবেশে গিয়ে বর্তমান রাজ্য সরকারের সমালোচনার পাশাপাশি আত্ম-সমালোচনার সুরও শোনা যাচ্ছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বা বিমান বসুদের গলায়। তাঁদেরকে এখন প্রায়শই বলতে শোনা যাচ্ছে, দলে কারও মাতব্বরী সহ্য করা হবে না, মানুষের কাছে যেতে হবে, যারা এর পরেও 'দাদাগিরি' চালিয়ে যাবেন তাঁদের দল থেকে বের করে দেওয়া হবে। তবে তো এবার উল্টোভাবে ধরে নিতে হবে যে বাম

আমলে 'দাদাগিরি' বা 'মাতব্বরী' বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। আর তাই এখন প্রায় রুটিন করে কর্মীদের মানবিক হওয়ার পরামর্শ দিয়ে চলেছেন সিপিএম নেতা। এ তো সেই অনেকটা 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে'-র মতো বিষয়। তাহলে জনগণের তো এখন এই প্রশ্ন থাকতেই পারে যে, ক্ষমতায় থাকাকালীন তাহলে কেন সবকিছু জেনে বুঝেও মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন সিপিএম নেতৃত্ব? আবার আরেকটু অন্যভাবে ভাবলে এটাও কি ধরে নেওয়া যায় যে, ক্ষমতায় ফিরে এলে আর ওসব শুদ্ধিকরণের পথে হাঁটত না সিপিএম?

বঙ্গে সিপিএম নেতারা তো বটেই, সিপিএমের কেন্দ্রীয় স্তরের নেতারাও সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকায় বেশ বিরক্ত। তাঁরা অনেকেই বলছেন, সংবাদ মাধ্যম এখন বিচারকের ভূমিকা পালন করছে, ঠাণ্ডা ঘরে বসে অনেক কিছুই বলা যায়, কিন্তু রাজনীতি হয় না। কিন্তু একথাও আপনাদের মনে করিয়ে দিই যে, কোনও এক সময় এক বহুল প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্রে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে 'ব্র্যাণ্ড বুদ্ধ' বলা হয়েছিল। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পনীতির সপক্ষে সওয়াল করা হয়েছিল। তখন তো কই আপনারা কেউ বলেননি যে, এমন প্রচারের কোনও প্রয়োজন নেই।

প্রচার না করলেও সিপিএম জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালন করবে। আজ যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে সংবাদ মাধ্যমের একটা অংশ 'অপপ্রচার' করছে তাহলে তা নিয়েও আপনারা মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? প্রায় প্রতিটি দলীয় সমাবেশ থেকে শুরু করে সাংবাদিক বৈঠকে পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমের ভূমিকার সমালোচনা করে চলেছেন। সংবাদমাধ্যম 'বিচারক' হোক বা নাই-ই হোক, তারা তাদের মতো করে একটা সংবাদ প্রেরণ করে। তা নিয়ে আপনাদের এত মাথাব্যথা হচ্ছে কেন? তাহলে কি এটা ধরে নেওয়া যায়, আপনাদের পক্ষে খবর হলে কোনও কথা বলবেন না। আর বিপক্ষে হলেই 'অপপ্রচার'-এর মতো শব্দের অবতারণা করবেন?

রাজনৈতিক মহলে একটা বিষয় বারে বারেই উঠে এসেছে যে, সুশান্ত ঘোষকে গোলাপ সহযোগে সংবর্ধনা কতটা ন্যায়সঙ্গত? ফরওয়ার্ড ব্লক নেতার মন্তব্য, এতদিন পর দলের এমন একজন হেভিওয়েট নেতা জামিন পেলে সেই দলের ছাত্র এবং যুবদের মধ্যে উল্লাস হওয়া তো স্বাভাবিক। এই ধরনের এড়িয়ে যাওয়া মন্তব্য রাজনীতিতে আদৌ কি শোভা পায়? বা আরও স্পষ্টভাবে বলতে হলে, রাজনীতির আঙিনায় এমন কথা যুক্তিযুক্ত নয়। যেখানে সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে এতগুলো মামলা এখনও চলছে সেখানে কিভাবে এমন কথা ব্যবহার করছেন একজন বামপন্থী নেতা? আসলে জাতীয় রাজনীতিতে বরাবরই এমন ভূমিকা পালন করে গিয়েছে বাম দলগুলি। সরকারকে সমর্থন করব, কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রে সরাসরি নিজেদের যুক্ত রাখব না। চোর যখন চুরি করতে কোনও বাড়িতে ঢোকে তখন পালানোর রাস্তাটাও খোলা রাখে (একথা কাউকে আঘাত দেওয়ার জন্য বলছি না)। জাতীয় রাজনীতিতে বামেদের ব্যাকফুটে চলে যাওয়ার কারণও ঠিক এটাই।

অর্থাৎ যত পার চুরি করে যাও, ধরা না পড়লেই হল। ফরওয়ার্ড ব্লকের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র একটি কথাই বলা যায়, আপনারা বামফ্রন্টের

শরিক হতেই পারেন। তা বলে আপনাদের নিজস্বতা বলতে কি কিছুই থাকবে না। তাহলে আপনারা ঠিক কোন ধরনের কমিউনিজমে বিশ্বাসী?

বামপন্থীদের আজ মনে হচ্ছে, এবার একটু ভারতীয়ত্বে ফেরা দরকার। সেজন্য ১৯৬৮ সালের পর আবার মতাদর্শগত দলিলকে ভারতীয় ধাঁচে তৈরি করে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে নামতে হয়েছে সিপিএমকে। ভারতে বসে অন্যের দেশের চেয়ারম্যানকে নিজেদের চেয়ারম্যান বলা বা ভিয়েতনামকে 'তোমার নাম, আমার নাম' আখ্যা দেওয়া যে কতখানি 'ভুল' ছিল তা বোধহয় বুঝতে পারছেন কারাতরা। তাই ভারতীয়ত্বে ফেরার তাগিদ অনুভব করা।

সুশান্ত ঘোষকে সংবর্ধনা দেওয়ার বিষয়টি কংগ্রেস যে ভাল চোখে দেখছে না তা কৃষ্ণাদেবীর কথাতেই স্পষ্ট। তা সত্ত্বেও এই অবস্থান রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রকাশ্য রাজপথে নিয়ে আসছে না। এমন অবস্থান কেন নিচ্ছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা তা কিন্তু পরিষ্কার নয়। আজ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে কংগ্রেস যেভাবে জেহাদ ঘোষণা করছে, সেই চিত্র বামফ্রন্ট সরকার থাকার সময় কেন দেখা যায়নি? জনগণ কিন্তু সেই প্রশ্নটিও রেখেছে। বর্ধমানের মঙ্গলকোটে সিপিএম কর্মীদের তাড়া খেয়েও কেন সেদিন মানস ভুঁইয়ারা শহরের রাজপথে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন না?

এটাও কি তাহলে ধরে নিতে হবে যে, বামপন্থী দলগুলি যেহেতু তখন কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থন করেছিল তাই এ রাজ্যে সেভাবে সরব হয়নি কংগ্রেস? কেন্দ্রে গাঁটছড়া বাঁধার অর্থ কি রাজ্যেও প্রতিবাদের সুর স্তিমিত হয়ে যাওয়া? রাজনীতিতে মাতব্বরী ফলানোই যদি বড় কথা হয় তবে একটি কথাই পরিষ্কার করে বলে রাখা ভাল যে, জনগণই একজন নেতাকে নিজেদের প্রতিনিধি করে বিধানসভা বা লোকসভায় পাঠান। আর সেই জনগণের দায়িত্ব পালন করবেন বলেই চেয়ারে বসেন প্রতিনিধিরা। অথচ ক্ষমতাইজম সেখানে কখন যেন বড় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু জনগণ যে এমন মাতব্বরী সহ্য করবে না তা তিন দশকের বাম রাজত্ব তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়ার ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

তাই কোন দল তাঁদের নেতাকে জননেতা বলে ভাবলেন তা বড় কথা নয়। জনগণ কাকে নেতার সম্মানে সম্মানিত করছেন সেটাই আসল কথা।

[সৌজন্যে : দৈনিক সংবাদ]

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কার্যকর্তা কর্মশালা

বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত জয়ন্তীকে কেন্দ্র করে বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারীর তত্ত্বাবধানে সঙ্ঘ ও সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনগুলির সক্রিয় সহযোগে দেশব্যাপী বহুবিধ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে। মূলতঃ ২০১২ সালটি সামগ্রিক প্রস্তুতিবর্ষ তথা ২০১৩ বছরটি সম্পূর্ণভাবে সমারোহ উদ্‌যাপনের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। স্বামীজীর স্বপ্নের বৈভবশালী নুতন ভারত গড়ার লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত কর্মসূচী পালনের এক ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। ৫টি ক্ষেত্র বা আয়াম ও ৪টি কার্যবিভাজন যথা— (১) প্রবুদ্ধ ভারত (নাগরিক), (২) যুবশক্তি (ভারতে মোট জনশক্তির ৫৫ শতাংশ), (৩) সম্বর্ধিনী (মাতৃ/নারীশক্তি), (৪) অস্মিতা (জনজাতি, উপজাতি, বনবাসীসমাজ), (৫) গ্রামায়ন (গ্রাম্য সমাজ)— এই পাঁচ প্রকারের আয়াম, সংযোজক, সহসংযোজক, কার্যালয়, প্রচার সাহিত্য ও অর্থ— মোট ১১ জন করে একটি সক্রিয় টোলি (টিম) প্রদেশ, জেলা ও নীচের স্তরে নির্মাণ করে সম্পূর্ণ কাজের পরিচালনা করা হবে। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে মুম্বই নগরীতে কেন্দ্রীয় কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। জেলাগুলির ১১ জন করে কার্যকর্তা, তদূর্দ্ধ কার্যকর্তা ও বিবিধক্ষেত্রের কার্যকর্তাদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালাতে নির্ধারিত কার্যকর্তাদের যথাসময়ে পূর্ণ সংখ্যাতে উপস্থিত থাকার জন্য আগ্রহ করা হচ্ছে।

কর্মশালার স্থান—
'মারোয়াড়ি পঞ্চায়েত ভবন'
চার্চ রোড, শিলিগুড়ি

দিনাঙ্ক—৭ই এপ্রিল, শনিবার, বেলা ১০টা থেকে ৮ই এপ্রিল দুপুর পর্যন্ত।

প্রবেশ নিধি—৫০ টাকা মাত্র, রাত্রিবাস ও লেখন সামগ্রী সঙ্গে আনবেন।

শুভেচ্ছা ও নমস্কারসহ

অমরকৃষ্ণ ভদ্র—সংযোজক
কেশবানন্দ পাল—সহ-সংযোজক
স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধশত সমারোহ
(আয়োজন) সমিতি-উত্তরবঙ্গ
(সিকিম সহ)

আমাদের সমাজের ঐক্য ও সংহতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ : আর এস এস

গত ১৬ থেকে ১৮ মার্চ নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক হয়ে গেল। এই বৈঠকে সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত পুরো সময় উপস্থিত ছিলেন। সারা দেশ থেকে প্রায় ১৪০০ জন প্রতিনিধি বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী তাঁর কার্যবিবরণীতে জানান যে সারা দেশে ২৭৯৭৮ টি জায়গায় ৪০৮৯১টি শাখা চলছে। ৮৫০৮ স্থানে সাপ্তাহিক মিলন ও ৬৪৪৫ স্থানে সঙ্ঘমণ্ডলী হিসাবে কাজ চলছে। এইবছর সারা দেশে সঙ্ঘের প্রথমবর্ষ শিক্ষাবর্গে ৭৩২২ স্থান থেকে ১১৫০৭ জন শিক্ষার্থী এবং দ্বিতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে ২০১২ স্থান থেকে ২৭৮১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। নাগপুরে তৃতীয়বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গে ৬৭৫ স্থান থেকে ৭৩২ জন এবং তৃতীয়বর্ষ বিশেষ বর্গে সারা দেশ থেকে ৪৭৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। এই বৈঠকে দুটি বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাব দুটি হলো— আমাদের সমাজের একতা ও সংহতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে তুলে ধরা এবং রাষ্ট্রীয় জলনীতি বিল ২০১২-এর পুনর্বিচার আবশ্যক। দুইটি প্রস্তাবই এখানে পুরোপুরি প্রকাশ করা হলো।

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষুব্ধ মানুষ নানান প্রতিবাদ আন্দোলন সংঘটিত করছেন। এর কোনওটা জমির অধিকার, কোনওটা বা নদী বাঁধ কিম্বা রাজনৈতিক অধিকার, আবার কখনও বা নদীর জলের ভাগ নিয়ে বিরোধ। এছাড়া অনেক সময় বিভিন্ন রাজ্যের মানুষদের অন্য একটি রাজ্যে বসবাস উদ্ভূত সমস্যা নিয়েও আন্দোলন দানা পাকাচ্ছে। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা, অনেক সময় জাতি ধর্ম বর্ণ নিয়েও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মনকষাকষি মাথাচাড়া দিচ্ছে। এই রকম নানান আন্দোলনের পুরোভাগে থাকা কিছু তথাকথিত নেতা-নেত্রীদের নিজস্ব স্বার্থ ও দুরভিসন্ধি জড়িত থাকায় অনেক সময়ই তাদের কার্যকলাপে সমাজের বিভিন্ন বর্গের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের জন্ম হচ্ছে। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধিসভা এই ঘটনায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। প্রতিনিধি সভা মনে করে এই ধরনের প্রতিবাদ আন্দোলনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয়দের অত্যন্ত সাবধানী ও সংযমী হওয়ার প্রয়োজন আছে। সমাজের একতা ও সংহতি রক্ষা করার বিষয়টির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে তবেই এই আন্দোলনগুলির গতিবিধি পর্যালোচনা করা দরকার।

কিন্তু পরিতাপের সঙ্গে এটাই দেখা যাচ্ছে যে সামাজিক একতা ও সংহতির প্রশ্নটিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জনতার ভাবাবেগকে সুড়সুড়ি দিয়ে আন্দোলনের ছুতোয় রাজনৈতিক ফয়দা তোলাটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে জনশিক্ষা ও চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সংবাদ মাধ্যমের এক কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক চমক দেওয়ার প্রবণতার ফলে মিডিয়া এই সমস্ত আন্দোলনগুলির খবর পরিবেশনে যে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছে, তার পরিণামে আন্দোলনের উদ্দেশ্যই শুধু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে না, সামাজিক পরিকাঠামোটিরও ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। অথচ অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী ও বেসরকারী সেবামূলক সংস্থাকে এই সমস্ত বিক্ষোভ আন্দোলনগুলির পুরোভাগে দেখা গেলেও তাঁরা একটি বিষয় একবারে এড়িয়ে যাচ্ছেন। তাহল এই সমস্ত আন্দোলনকারীদের মধ্যে ঢুকে থাকা ছদ্মবেশী বিভেদকামী শক্তিগুলির কার্যকলাপ। আন্দোলনকে ভেতর থেকে বিপথগামী করা শুধু নয়, এই নেতারা ভারতীয় সমাজ জীবনে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করে পারস্পরিক বিভাজন অবশ্যম্ভাবী করে তুলছেন। স্বঘোষিত স্বেচ্ছাসেবী নেতাদের কাছে আবেদন— বিদ্বেষের এই চষা জমিতে সুযোগসন্ধানী বিদেশী শক্তি যাতে ফসল তুলতে না পারে সে সম্বন্ধে যেন তাঁরা সজাগ হন। প্রতিনিধি সভা এই সঙ্কটকালীন পরিস্থিতিতে সংবাদমাধ্যম ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে যথার্থ গঠনমূলক ভূমিকা নিয়ে আন্দোলনগুলিকে সঠিক দিশায় পরিচালনা করার আবেদন জানাচ্ছে।

অবশ্য অনেক সময়ই যথার্থ অসন্তোষ ও বিরাগের কারণেই যে আন্দোলনসমূহ দানা পাকাচ্ছে সে ব্যাপারে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। তবু সমস্ত কিছু বিবেচনা করার পরেও প্রতিনিধি সভা বিক্ষোভরত জনগণকে আমাদের সমাজের বৃহত্তর একতা ও সংহতির কথা সব সময়ই স্মরণে রাখার অনুরোধ জানায়। আন্দোলন সফল করতে গিয়ে আন্দোলনকারীরা এমন কিছু দাবী না করে বসে যা পুরণ হলে আমাদের সমাজের অন্তর্গত বাঁধনটিই আলগা হয়ে জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল করবে।

এই প্রসঙ্গে প্রতিনিধি সভা অত্যন্ত আশঙ্কার সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে সরকার কম্যুনাল অ্যান্ড টারগেটেড ভায়োলেন্স বিল ও নতুন করে বাড়তি সংখ্যালঘু সংরক্ষণের প্রস্তাবগুলি এনে সমাজের বিভিন্ন বর্গের মধ্যে বিভেদ, অনৈক্য ও বিদ্বেষের পরিস্থিতি তৈরি করছে। কেন্দ্রীয় সরকার এমনকী কিছু কিছু রাজ্য সরকারও ও বি সি-দের জন্য নির্ধারিত ২৭ শতাংশ কোটা থেকে সংখ্যালঘুদের জন্য বাড়তি ৪.৫ শতাংশ সংরক্ষণ বার করে নেওয়ার যে অসাংবিধানিক অপচেষ্টা শুরু করেছে, সমগ্র ভারতবাসীর তা পত্রপাঠ বাতিল করা অবশ্য কর্তব্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিনিধি সভা মনে করে জাতীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনও স্বল্প মেয়াদী রাজনৈতিক লাভালাভের উদ্দেশ্যকে বড় করে না দেখে এক জাতি এক প্রাণের নীতিকেই আদর্শ করা উচিত। উল্লেখিত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিনিধি সভা সমগ্র দেশবাসীকে তো বটেই, বিশেষ করে স্বয়ংসেবকদের অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা নিয়ে স্বার্থসিদ্ধিতে তৎপর এক শ্রেণীর বিভেদকামী মানুষের জাতীয় জীবনের ঐক্য ও সামাজিক সংহতিকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টাকে রোধ করতে হবে।

সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধিসভায় গৃহীত দ্বিতীয় প্রস্তাব

জাতীয় জলনীতি বিল - ২০১২ নিয়ে পুনরায় ভাবনা-চিন্তা করা দরকার

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের সমগ্র জীব-জগতের পবিত্র ঐতিহ্য। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার সুচিন্তিত অভিমত হলো, আমাদের জলসম্পদ, মাটি, বাতাস, খনিজ সম্পদ, পশুসম্পদ, জীববৈচিত্র্য এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের বিষয়কে ব্যবসায়িক লাভালাভের দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। ওই সকল সম্পদের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি আমাদের দৃষ্টিকোণ নীতি ও ব্যবহার তৎকালিক লাভ অপেক্ষা সকল জীবজগতের সৃষ্টির সুদীর্ঘ পারস্পরিক সহাবস্থান নীতির অনুসারী থাকা উচিত। পৃথিবীর ২.৫ শতাংশ জমিতে ৪ শতাংশ শুদ্ধ জলের উপর আমরা ১৭ শতাংশ মানুষ নির্ভরশীল। এই পরিস্থিতিতে পঞ্চভূতের অন্তর্গত 'জল' (অপ) হলো প্রকৃতির পবিত্র অবদান। তার উপর বাণিজ্যিক লাভের জন্য সরকারের পদক্ষেপ অত্যন্ত দুশ্চিন্তাজনক।

কেন্দ্র সরকারের সাম্প্রতিক জাতীয় জল-নীতির খসড়ায় জল-কে জীবনের ভিত্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং বহুজাতিক কোম্পানীর প্রস্তাবিত বাণিজ্যিক মডেলকে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘৃণ্য মানসিকতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। জল-নীতির এই নতুন খসড়ায় জল ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে জলকরের প্রস্তাব, জলবিদ্যুৎ-এর দাম বাড়ানোর প্রস্তাব প্রভৃতি রয়েছে। এর ফলে জলও সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে। সবমিলিয়ে বহুজাতিক কোম্পানীগুলির জলের কারবার চাঙ্গা করার পথ প্রশস্ত হচ্ছে। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রস্তাব অনুসারে জল পরিবেশনে সার্বজনিক ও ব্যক্তিগত অংশীদারিত্বের নামে সার্বজনিক নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে। শেষ অবধি দেখা গেছে 'জল' ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে বহুজাতিক কোম্পানীর দখলে চলে যাবে। পৃথিবীর সর্বত্রই জলের একচেটিয়া কারবার, জলের আপূর্তি বা প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ, জলের গুণগত বৈশিষ্ট্য, নিয়মিত যোগান--- সর্বতোভাবে নিরাশাজনক। সরকারের প্রস্তাবিত জলনীতির ফলে জল অর্থকরী ভোগ্যপণ্যে পরিণত হতে চলেছে। যার ফলে সরকারের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক পরামর্শদাতাদেরকেই সিদ্ধান্তগতভাবে সমর্থন দেওয়া হবে মাত্র। তারা ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে কোটি কোটি ডলার রোজগারের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখছে।

সরকার যদি 'জল'-কে ব্যক্তিগত লাভের পণ্যে পরিণত করে জলের দাম বাড়ানোর দিকে পা বাড়ায় তাহলে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে।

সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধিসভা মনে করে, জল আমাদের সম্পূর্ণ সৃষ্টি ও জীবজগতের জীবনধারণের ভিত্তি। এজন্য সরকারের দায়িত্ব হলো— জলসম্পদের সঠিক ব্যবস্থা করা, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি শুদ্ধ পানীয় জল সহজে পেতে পারে এবং যথাযথভাবে সঠিক দামে সকলের কাছে জল পৌঁছানো যায়। জাতীয় জল-নীতি প্রণয়নের আগেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপযোগিতার জন্য গ্রামসভা থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা এবং সেইমতো নীতি নির্ধারণ করা প্রাথমিকভাবে আবশ্যক। এই পরিপ্রেক্ষিতে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধিসভা সকল দেশবাসীকে আহ্বান জানায় যে, তাঁরা যেন জলের মতো প্রকৃতিদত্ত সম্পদের অসদুপযোগ, অপচয় এবং তাবৎ দূষণকারী প্রক্রিয়া থেকে দূরে থেকে জল-সংরক্ষণের জন্য যতদূর সম্ভব প্রচেষ্টা করেন। একইসঙ্গে প্রতিনিধিসভা সরকারের কাছেও প্রত্যাশা করে যে, জলের মতো প্রকৃতি প্রদত্ত উপহারকে কোনও একচেটিয়া ব্যবসায়ীকে না দিয়ে জলের সংরক্ষণ, সংবর্ধন এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থার নীতি গ্রহণ করেন। জলের বর্ধমান চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে পর্যাপ্ত জল প্রদান করার জন্য জলের পুনঃপরিস্রুতকরণ, লবণ নিষ্কাশন থেকে শুরু করে নদীর বহমান জলরাশির সার্থক ব্যবহার সুনিশ্চিত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এসবেরই প্রয়োজন আছে। দেশের জলস্রোতের সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের দৃষ্টিতে গঙ্গা-যমুনা এবং অন্যান্য নদীর জলের দূষণ বন্ধ করা এবং সরস্বতী নদীকে পুনঃপ্রবাহিত করানোর জন্য কার্যকর প্রচেষ্টা নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের উচিত এই কাজের জন্য সমাজ, সমাজসেবী সংস্থা এবং ধর্মাচার্যদেরকেও আহ্বান করা। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধিসভা সরকারকে সতর্ক করে দিতে চায়— ওইসব না করে সরকার যদি 'জল'-কে ব্যক্তিগত লাভের পণ্যে পরিণত করে জলের দাম বাড়ানোর দিকে পা বাড়ায় তাহলে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে।

একা সুশান্তয় রক্ষা নেই, লক্ষ্মণ দোসর

মাননীয় লক্ষ্মণ শেঠ
ভবানী ভবন,

লক্ষ্মণবাবু এই চিঠি যখন পড়ছেন তখনও ভবানী ভবনে না থাকলেও ওই গোয়েন্দা বাড়ির সঙ্গে আপনার যোগাযোগ থাকবেই।

একদিন যা আপনার ও আপনার দলের কাছে ছিল সূর্যোদয় আজ তাই সূর্যাস্ত হয়ে নেমে এল। আইনের বিচার কী হবে সময় বলবে তবে জনতার বিচারে ইতিমধ্যেই শাস্তি সম্ভবত পেয়ে গেছেন আপনি। শাস্তি পেয়েছে আপনার দল সিপিএমও।

কদিন আগেই পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে কালো দিন ১৪ মার্চের। ২০০৭ সালের সেই নারকীয় কাণ্ডের পর নন্দীগ্রামের দখল নিতে মরিয়া হয়ে ওঠেন আপনারা। গোয়েন্দা তথ্য বলছে, ৪ নভেম্বর নন্দীগ্রাম ও খেজুরির মাঝে তেখালি ব্রিজ থেকে তুলে নেওয়া হলো পুলিশের আউট পোস্ট। ৬ নভেম্বর সিপিএমের কলাগাছি জোনাল অফিসে বসে ঠিক হয় নন্দীগ্রাম পুনর্দখলের ব্লুপ্রিন্ট। আপনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অশোক গুড়িয়া, অমিয় সাহু, হিমাংশু দাস, তপন ঘোষ, সুকুর আলি সহ অনেক মাতব্বর। তবে আপনিই ছিলেন নেতা। আপনার অঙ্গুলি হেলনেই তখন পুলিশ ওঠবস করত। আবার যে জমি দখলের নোটিশ নিয়ে এত কেলেঙ্কারি, এত রক্ত তার মূলেও তো ছিলেন আপনি। এটা আপনার থেকে বেশি কেউ জানে না।

যাই হোক, আপনাদের সেই বৈঠকের পরপরই প্রশাসনিক উদ্যোগে সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে শান্তি বৈঠক হলো। ১০ নভেম্বর নন্দীগ্রামে মিছিল করল ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি। উপস্থিত ছিল এই পত্রলেখকও। নারী, পুরুষ, শিশুদের সেই মিছিল তখন গোকুলনগরে। চারদিক থেকে ঘিরে শুরু হলো হামলা। চলল বোমা, গুলি বর্ষণ। এরপর ৩০০ জনকে শেরখাঁ চকের আমড়াতলা স্কুলে বন্দি করলেন। নন্দীগ্রামের দখল নিলেন। আর সেই দিনই আপনাদের মহাতীর্থ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট বলল, এটা পুনর্দখল নয়, নন্দীগ্রামে সূর্যোদয়।

লক্ষ্মণবাবু সেই কাণ্ডে ৭ জন নিখোঁজের অভিযোগ ওঠে। বাম আমলের জেলা পুলিশ তদন্ত করলেও কিছুই কিনারা হয়নি। পরে ৬ জনের দেহ উদ্ধার হয়। পুনর্দখলের রাতেই বৃদ্ধা কল্পনা মুনিয়ান সহ তিন জখম তৃণমূল সমর্থককে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স করে পালানোর সময় এগরার কাছে ধরা পড়ে যান পশ্চিম মেদিনীপুরের সিপিএম নেতা তপন ঘোষ, সুকুর আলি। পরে ছাড়াও পেয়ে যান। এসব তথ্য বলছেন গোয়েন্দারা। কিন্তু এই পত্রলেখক এসব গল্প শুনেছে ওই বৃদ্ধা কল্পনা মুনিয়ানের কাছে। আর সেই অত্যাচারের বিবরণ শুনলে বড় বড় স্বৈরাচারির গায়েও কাঁটা দিতে পারে। শুনেছিলাম, জখম কল্পনাদেবীকে মেরে ফেলার জন্যই নিয়ে যাচ্ছিলেন আপনারা। সেদিন সেই অ্যাম্বুলেন্স ধরা না পড়লে সে কাহিনী শোনা হোত না।

রাজ্যে পালাবদলের পর গত অক্টোবর মাসে নিখোঁজ ৬ জনের পরিবারের আবেদনে সাড়া দিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট সি আই ডি তদন্তের নির্দেশ দেন। তদন্তে নেমে সিআইডি খেজুরির সিপিএম নেতা অজিত বর সহ ১৩ জনকে গ্রেফতার করে। এরপর ৩০ জানুয়ারি ওই কাণ্ডে ৮৮ জনের নামে চার্জশিট পেশ করে সিআইডি। অভিযোগ তোলা হয় পরিকল্পনা করে হামলা, অপহরণ, খুন ও তথ্য প্রমাণ লুঠের। বলা হয়েছে লক্ষ্মণ শেঠদের নেতৃত্বে সেদিন গোকুলনগরে বোমা, গুলি চালিয়ে হামলার পাশাপাশি বহু মানুষকে অপহরণ করা হয়। পরে কয়েকজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ২ জন জখমকে কামড়দহ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সিআইডির অভিযোগ খেজুরির জননী ইটভাটায় রাখা ছিল নিহতদের দেহ। পরে তা শ্যামপুর কটকার খালে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

সেই চার্জশিটের পর থেকেই ফেরার ছিলেন আপনি। দেশের নানাপ্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন। পার্টির ব্যবস্থায় কিনা জানা নেই। তবে হলদিয়ার শিল্পাঞ্চলের ওপর এখনও যে আপনার ছড়ি ঘোরে সেটা বোঝা গেল। মুম্বইয়ের চেম্বুরে শ্যাম নিবাস নামের যে গেস্ট হাউস থেকে আপনি সপার্ষদ গ্রেফতার হলেন তাঁর মালিক কিন্তু নুন খেয়ে নেমকহারামি করেনি। একদিন তাঁকে হলদিয়ায় শিল্প করার জমি পাইয়ে দিয়েছিলেন। আজ তিনি আপনাদের আশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না।

সত্যি লক্ষ্মণবাবু একেই বলে বিধির বিধান। একদিন আপনার কথায় হলদি নদীর ঘাটে বাঘে গোরুতে একসঙ্গে জল খেত। হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আপনিই চালাতেন। কবি স্ত্রী তমলিকা দেবীকে চেয়ারপার্সন করে বকলমে পুরসভাটাও আপনিই চালাতেন। বাইরে থেকে দলীয় দফতর শ্রমিকভবন। আর ভিতরে বিলাসবহুল সর্বহারার জীবন যাপন করতেন। এনিয়ে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো আজ আপনার দলের যাঁরা আপনার নিন্দায় পঞ্চমুখ তাঁরা কিন্তু তখন আপনার নিন্দা করেননি। কী বলছেন? নিন্দা করছে না? পার্টি পাশে থাকবে বলেছে? সেতো বলবেই, কিন্তু শুদ্ধিকরণের নামে আপনাকে রাজ্য কমিটি থেকে বাদ দিয়েছে এটা তো মানবেন। আর যে বুদ্ধবাবু আপনাকে দলের আপদ তকমা দিয়ে ছেঁটে দিলেন, নন্দীগ্রাম ম্যানেজ করার জন্য কিন্তু এই লক্ষ্মণ শেঠই তাঁর বড় ভরসা ছিলেন। এখন আপনাকে কাঠগড়ায় তোলা হলে তাঁদেরও যে কাঠগড়ায় তোলা দরকার।

আপনি শুনলে কষ্ট পাবেন কিন্তু সত্যি বলছি আলিমুদ্দিন চুপি চুপি কী বলছে জানেন? বলছে 'একা সুশান্তয় রক্ষা নেই লক্ষ্মণ দোসর'।

নমস্কারান্তে,

—সুন্দর মৌলিক

এই কি পরিবর্তন?

গাছে না উঠতেই এককাঁদি। রাজ্যের জনগণ কাম ভোটারগণের যাবতীয় আশায় একফোঁটা গোচোনা ফেলে দিল একবছর বয়স না হওয়া নাবালক রাজ্য সরকার। ফসলের দাম না পাওয়ায়, ফসল তৈরি করার পর তা নষ্ট হয়ে যাওয়া, ঋণ করা টাকা শোধ দিতে না পারায় বহু চাষী আত্মঘাতী হয়েছেন, এখনও হচ্ছেন। এটাও পরিবর্তন।

এবার আসা যাক চিকিৎসার ব্যাপারে। প্রায়ই দিনই সংবাদপত্রে দেখা যাচ্ছে হাসপাতাল রোগী, রোগিণীকে ফেরত পাঠাচ্ছে। যার ফলে রাস্তায় সন্তান প্রসব হয়ে যাচ্ছে ও চিকিৎসার অভাবে সদ্যোজাতরা মারা যাচ্ছে। ডাক্তারগণের অবহেলায় সুচিকিৎসা তো দূর অস্ত, রোগী বা রোগিণীকে ভর্তিই করা হচ্ছে না। গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো কিছু কিছু স্বাভাবিক কিছু আবার প্রতিবন্ধী রোগিণী, আবার মূক বধির রোগিণীদের ডাক্তারবাবুরা ধর্ষণ করে তাদের কামলালসা চরিতার্থ করছেন।

এরকম ভাবে রোগিণীদের ধর্ষণ কিন্তু ১০ বছর আগে ছিল না। আর শুধু রোগিণীদের কেন, সংবাদপত্রে দৈনিক যেভাবে ধর্ষণের সংবাদ প্রকাশ হচ্ছে তাতে করে বলা যায় সকল ধর্ষণের সংবাদ একত্রিত করে যদি সপ্তাহে একটি 'ধর্ষণ সংবাদপত্র সংখ্যা' প্রকাশ করা হয় তাহলে মনে হয় সত্যের অপলাপ হবে না। আজ নাবালিকা ধর্ষণ, কাল মূকবধির ধর্ষণ, পরশু প্রতিবন্ধী ধর্ষণ— রোজ ধর্ষণের খবর আছেই।

পরিবর্তনের যুগে নতুন যা ঘটনা সব ঘটছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি একটি কর্মনাশা বনধ্ পালিত হলো। শাসকদল বলছে বনধ্ ব্যর্থ, বিরোধীদল বলছে বনধ্ সর্বাত্মক। যাই হোক সামরিক আইনের ন্যায় ফতোয়া জারি ছিল স্কুল-কলেজ অফিস আদালতে না এলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তাতে বাস ট্রেন, ট্রেকার বা যাত্রীবাহী কোনও যানবাহন চলুক বা না চলুক! তাতে করে কর্মীগণ ভয়ে নিজেদের সুখশয্যা ত্যাগ করে একরাত্রি মশার কামড় সহ্য করে নিজ নিজ কর্মস্থলে ও পায়ে হাঁটা নিকটবর্তী অঞ্চলে রাত কাটিয়ে শাসকদলের নেত্রীর লালচক্ষুকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। আর যারা নেহাতই আসতে পারেনি (শতকরা হিসাবে ১০ শতাংশ) তাদেরও নাকি কোনও সাজা দেওয়া হবে না বলে পরের দিন সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশ হয়েছিল বটে কিন্তু 'ম্যাডামে'র নির্দেশে তাদেরও একটা পূর্ণাঙ্গ তালিকা করার এতেলা দিয়েছেন অগণতান্ত্রিক মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়া। হাজিরা খাতা তো ছিলই, সেই দেখেই গরহাজিরের তালিকা প্রস্তুত করতে কোনও অসুবিধা হবার কথা নয়, কিন্তু তা করতে গিয়ে

দেখা গেল অফিসের হাজিরা খাতার একটি পৃষ্ঠা অফিসের রেজিস্টারে নেই, হয়তো বা অনুমান করা হচ্ছে গরহাজিরাদের কারও বাড়িতে সেটি অন্তরীণ অবস্থায় আছে। এই প্রকার ঘটনা পরিবর্তনের সরকারের ক্ষেত্রে প্রথম ঘটনা।

—দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান।

মুসলিম সংরক্ষণ

'সেকুলারবাদী' (মুসলমান তোষণকারী) বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সরকার দীর্ঘদিন ধরে চাকরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের সংরক্ষণ দেওয়া নিয়ে সরব রয়েছে। কংগ্রেস, তৃণমূল, এন সি পি, বি এস পি, আর জে ডি, এল জে পি, আর এল ডি, ডি এম কে, এ ডি এম কে, টি ডি পি, জে ডি এস, সি পি এম, সিপিআই, আর এস পি—কে নেই এই দলে? অর্থাৎ কংগ্রেস, কমিউনিস্টরাই শুধু নন, মুলায়ম, মায়াবতী, লালুপ্রসাদ, রামবিলাস, চন্দ্রবাবু, দেবগৌড়া, জললিতা, করুণানিধি, শারদ, অজিত প্রমুখ সবাই মুসলিম সংরক্ষণের পক্ষে। নির্বাচন এলেই এঁরা সংরক্ষণ নিয়ে শেয়ালের ন্যায় হুক্কা হুয়া রব তোলেন। উদ্দেশ্য, মুসলমান ভোটে দাঁও মারা। যেমন, এবার পাঁচ রাজ্যের বিধান সভা ভোটের প্রচারে কংগ্রেসসহ অন্য কয়েকটি দল মুসলিম সংরক্ষণের ভাঙা রেকর্ড বাজিয়েছিল। কোন্ দল কত শতাংশ সংরক্ষণ দেবে, চলেছিল তারও প্রতিযোগিতা। সবাই যেন 'দানছত্র' খুলে বসেছে। 'মামাবাড়ির মোয়া' আর কী! তবে এহেন সংরক্ষণ দেশভাগ কিন্তু ঠেকাতে পারেনি।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে ৬৪ বছর হলো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এত বছর পরেও শুনতে হচ্ছে মুসলিম সংরক্ষণের কথা। কেন? ভারত এতদিনে যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। হিন্দুদের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। আর্থ- সামাজিক দিক থেকেও অনেকটা উন্নত। শিক্ষা, সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া হিন্দুদের জন্য প্রায় ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ চালু রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন, এত বছর পরেও মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার তেমন ঘটেনি কেন? মুসলমানদের মধ্যে জন্মহার বেশি। শিক্ষার সঙ্গে জন্মহারের সম্পর্ক আছে। শিক্ষিত মুসলমানদের একটা বড় অংশ জন্মনিয়ন্ত্রণ মেনে চলেন। তাই আর্থিক দিক থেকেও তাঁরা সচ্ছল। তাই দেখা যাচ্ছে, শিক্ষাই পারে মুসলমানদের আর্থিক দিক থেকে উন্নত করতে।

মুসলমান সমাজে জাতপাতের বৈষম্য নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে সব মুসলমান এক--- আমীর-ফকির অভিন্ন। তবুও সাচার কমিটি, মিশ্র কমিটি মুসলমানদের মধ্যে উঁচু জাত, নিচু জাতের সন্ধান পেয়েছেন! এ প্রয়াস নিঃসন্দেহে ইসলাম বিরোধী এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইসলামের গ্লানি হলে যে মুসলমানরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন, দাঙ্গা বাঁধান, কিন্তু জাতপাতের ভিত্তিতে মুসলমান সমাজকে বিভাজিত করলে সেই মুসলমানরা নীরব থাকেন কেন? কেন, প্রাপ্তি যোগ থাকলে কী ইসলামের গ্লানি হয় না? সুবিধাবাদ আর কাকে বলে!

স্বাধীনতার পর প্রায় অর্ধশতাব্দী দেশ শাসন করেছে কংগ্রেস। কিন্তু এতবছর তাদের সরকার মুসলমানদের সুশিক্ষার দিকে নজর দেয়নি কেন? কেন, মুসলমান জন্ম-নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হয়নি? মুসলমানরা কেন যে আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ছে, তার সুলুক-সন্ধান করেনি? মাদ্রাসা শিক্ষা যে অবৈজ্ঞানিক তথা একপ্রকার ইসলামি শিক্ষা, সেকথা জেনেও কেন সরকার দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা চালু রেখেছে— মাদ্রাসা শিক্ষার পেছনে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করছে?

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

গোরক্ষা ও গোসেবা

ভোটপর্ব সমাপ্ত হয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নতুন কর্মসমিতি গঠন হয়েছে। ভারতের হিন্দু অধিবাসীদের বহু আকাঙ্ক্ষিত 'গোরক্ষা'-র জন্য নতুন করে আন্দোলন গড়ে তোলার এখনই উপযুক্ত সময় এসেছে।

ভারতের কসাইখানাগুলোর মালিকদের হিন্দু নামের লিস্ট বার করে গ্রামে শহরে জেলার তাদের সামাজিক বয়কট করার আহ্বান জানানো হোক। ভারতে গো-হত্যা সংবিধান অনুযায়ী বেআইনী। শুধু জনগণের প্রতিবাদ ও অভিযোগ দায়ের করা প্রয়োজন এই আইনকে কার্যকর করার জন্য। তাই প্রতি রাজ্যস্তরে এইসব গো-কসাইখানার মালিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা উচিত।

গোরক্ষা ও গো-সেবার মধ্যে দিয়েই ভারতবর্ষে সর্ববিধ শুভলাভ হবে। তাই কসাইদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের যত শীঘ্র সম্ভব শুরু করা উচিত।

—অমরনাথ দে, কলকাতা-৯।

আমাদের দেশের মানুষ দুর্নীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন পছন্দ করেন না?

এন. সি. দে

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, মণিপুর এবং গোয়া বিধানসভার নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়েছে। এই ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে এক গোয়া ছাড়া আর কোনও রাজ্যেই বিজেপি'র আসন সংখ্যা আগের বারের চেয়ে বাড়েনি বরং কমেছে।

এসবই তথ্য অর্থাৎ hard reality, এনিয়ে বিতর্ক চলে না। অস্বীকার করারও কোনও উপায় নেই। কিন্তু কেন এমন হলো? এ প্রশ্ন নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। এ বছরের নির্বাচনের ঠিক আগে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রশ্নে ব্যাপক গণআন্দোলন হয়েছিল। কখনও আন্না হাজারের নেতৃত্বে, কখনও বা রামদেব বাবার নেতৃত্বে। একদিকে লাগামছাড়া পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, অন্যদিকে একের পর এক প্রশাসনিক দুর্নীতি ফাঁস হয়েছে। জাতীয় বৃহৎ দল হিসেবে বিজেপি এই সকল আন্দোলনে ইন্ধন জুগিয়েছে। শুধু তাই নয়, লোকপাল বিল পাশ করার জন্য সংসদে ও সংসদের বাইরে লাগাতার আন্দোলন করেছে। লোকপাল বিল পাশ করা নিয়ে কংগ্রেস বরাবরই টালবাহানা করে এসেছে। সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেসকে সমর্থন করে গেছে। বহুজন সমাজ পার্টিও দুর্নীতির প্রশ্নে কংগ্রেস বিরোধিতায় নামেনি।

এটা আশ্চর্যের হলেও সত্যি যে দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসকে জনগণ গতবারের তুলনায় বেশি আসনে জিতিয়েছে আর তার সমর্থক সমাজবাদী পার্টিকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতাসীন করেছে। আর এক কংগ্রেস সমর্থক বহুজন সমাজ পার্টিকেও জনগণ বিজেপি'র চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেশি আসনে জিতিয়েছে। অথচ দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মূল হোতা বিজেপি-কে গতবারের চেয়েও কম আসনে জিতিয়েছে। বিজেপি-কে এবার বহুকালের নিশ্চিন্ত আসনগুলি থেকেও জনগণ উৎখাত করেছে।

সমাজবাদী পার্টি দুর্নীতির সঙ্গে দুর্বৃত্তায়ন ও ধর্ম-জাতপাতের রাজনীতি করে বাজিমাত করেছে। কংগ্রেস ও বি এস পি'ও তাই করেছে। অন্যদিকে নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজিহীন বিজেপি আন্না হাজারের হাওয়ায় গা-ভাসিয়ে জয়ের স্বপ্নে মশগুল হয়েছিল। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। দুর্নীতি না থাকলে যাদের অসুবিধা, তাদের সংখ্যাই আজ সব দলেই, সব প্রশাসনেই বেশি। উত্তরাখণ্ডে তারাই খাণ্ডুরিকে হারিয়ে দিয়েছে।

তাহলে কি মনে করতে হবে আমাদের দেশের মানুষ দুর্নীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন পছন্দ করে না বা গুরুত্ব দেয় না? সমাজবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে কোনও সমস্যা গা-সওয়া হয়ে গেলে সমাজ তা স্বাভাবিক বলে আত্মসাৎ করে নিতে বাধ্য হয়। এভাবেই দুর্বল, অপদার্থ, দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক নিজ প্রয়োজনে সমাজের সাধারণ মানুষজনকে অধঃপতিত করে থাকে।

সমাজবাদী পার্টি দুর্নীতির সঙ্গে দুর্বৃত্তায়ন ও ধর্ম-জাতপাতের রাজনীতি করে বাজিমাত করেছে। কংগ্রেস ও বি এস পি'ও তাই করেছে। অন্যদিকে নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজিহীন বিজেপি আন্না হাজারের হাওয়ায় গা-ভাসিয়ে জয়ের স্বপ্নে মশগুল হয়েছিল। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। দুর্নীতি না থাকলে যাদের অসুবিধা, তাদের সংখ্যাই আজ সব দলেই, সব প্রশাসনেই বেশি। উত্তরাখণ্ডে তারাই খাণ্ডুরিকে হারিয়ে দিয়েছে।

একথা ঐতিহাসিক ভাবেই সত্য যে এদেশের মানুষ চিরকালই রাজ্য বা ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন। রাষ্ট্রীয় সংকট তাদের উদ্বিগ্ন করে না। ধর্মীয় ও জাত-পাতের সংকট তাদের অনেক কাছের সমস্যা। তাই বিজেপি-কে সংসদের চৌহদ্দির আর্থিক-রাজনৈতিক চাপান-উতোরের আরামদায়ক মিডিয়া লড়াই ছেড়ে মানুষের নিজস্ব সমস্যার কাছে যেতে হবে সারা মাস, সারা বছর, সারাক্ষণ। মিডিয়ার ভয়ে হিন্দুত্বকে বিসর্জন দেওয়ার অর্থ হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। শুধু জনগণকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ধর্ম যে তাদের প্রাণ-ভ্রমরা, ভ্রমরাকে মেরে প্রাণ বাঁচাবে কেমন করে?

মণিপুরেও হয়েছে একই জিনিস। যে মানুষ কংগ্রেসের চাপিয়ে দেওয়া সামরিক আইনের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, এমনকী একটি মেয়ে গত ১০ বছর অনশন চালিয়ে যাচ্ছে, সেই মানুষ কেমন করে সেই কংগ্রেসকেই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে ক্ষমতায় বসালো। বিপরীত দিকে আবার তৃণমূল কংগ্রেস এই সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবিকে সুড়সুড়ি দিয়ে ৭টি আসনে বাজিমাতও করেছে। ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীর এই আচরণ বিশ্বের মানুষের কাছে কোন বার্তা পৌঁছে দেবে? অতএব বিজেপি'র কাছে শিক্ষা 'Nothing wise in war and love'. তবে নির্বাচন একটি যুদ্ধ, প্রেম নয়।

চৈতন্যযুগের পরবর্তী নতুন ধারার মন্দির

পর্ব — ৮

ক্ষীরপাই-এর মন্দির

ডঃ প্রণব রায়

ক্ষীরপাই :

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা থানার ক্ষীরপাই একটি ছোট্ট পৌরশহর। ঘাটাল-চন্দ্রকোণা রোড পাকা রাস্তা এই শহরের মধ্য দিয়ে চন্দ্রকোণা রোডে মিলিত হয়ে সেখান থেকে মেদিনীপুর শহরে এসে মিলিত হয়েছে।

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

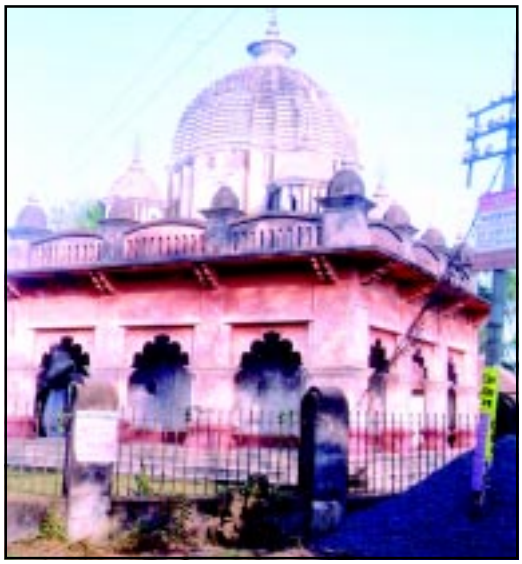

ক্ষীরপাই-এ উত্তমানন্দ আশ্রমের প্রাচীন 'রত্নমন্দির' (সংস্কারিত)।

অন্যদিকে, ক্ষীরপাই-এর কিছুটা পশ্চিমে কালিকাপুর থেকে কেশপুর হয়েও একটি পাকা রাস্তা মেদিনীপুর শহরে পৌঁছেছে। ক্ষীরপাই-এর হালদার দীঘির উত্তরদিকের রাস্তা বরাবর জাড়া, রামজীবনপুর হয়ে হুগলি জেলার গোঘাট থানার হাজিপুর হয়ে আরামবাগে উপস্থিত হয়েছে। অপরদিকে এই শহরের পূর্বদিকে ঘাটালগামী রাস্তায় ঘাটাল পৌঁছে, ঘাটাল-পাঁশকুড়া রাস্তা বরাবর দক্ষিণে ৬নং জাতীয় সড়ক (মুম্বাই রোডে)-এ যুক্ত হয়েছে। সেকারণে ক্ষীরপাই-এর সঙ্গে যোগাযোগ খুবই সহজসাধ্য।

এককালে উনিশ শতকের মাঝামাঝি ক্ষীরপাই মহকুমা শহর ছিল। তখন এই স্থান ছিল হুগলি জেলার অন্তর্গত। ইংরেজ ও ফরাসী কুঠিয়াল সাহেবরা এখানে তাঁত ও রেশম ব্যবসায়ের জন্য বহু কুঠি তৈরি করে আঠারো উনিশ শতকে। সেসময় অনেক ধনী বণিক এখানে বাস করত। বহু লোকালয় গড়ে ওঠে। দেবমন্দির অনেক তৈরি হয়। ক্ষীরপাই-এর সমৃদ্ধিসূচক সে সময়ের তৈরি অনেক মন্দির নষ্ট হয়ে গেলেও আজও বেশ কিছু এখনও লক্ষ্য করা যায়।

ক্ষীরপাই-এর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মন্দিরটি হলো, ঘাটাল-চন্দ্রকোণা একেবারে বাস রাস্তার পাশে 'দয়ালবাজার' এলাকায় ইঁটের তৈরি রাধাদামোদর ও শীতলার 'পঞ্চরত্ন' মন্দির। এই মন্দিরের সামনের তিন প্রস্থে টেরাকোটা মূর্তি ও অলংকরণের সমারোহ বিস্ময়কর। মন্দিরটি ১৭৩৯ শকাব্দ ১২২৪ বঙ্গাব্দে (১৮১৭ খৃস্টাব্দ) নির্মিত। সামনের লিপিটি এখানে উদ্ধার করা হলো :

(১) 'শ্রীশ্রী ঁরাধা/দামোদর/তব চরণ/ভরসা/

(২) শ্রীশ্রী ঁজিউ/সিতলা মাতা/তব চরণ ভ/রসা গো/

(৩) সকাব্দা ১৭৩৯ সন ১২২৪/সাল তারিখ ১ মার্গশীর্ষ/শ্রীমদন মোহন দত্ত'।

লিপি থেকে জানা যাচ্ছে, মদনমোহন দত্ত এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। লিপিটি ৩টি প্রস্থে খোদিত। বহু টেরাকোটা অলংকরণের মধ্যে কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণ ও যশোদা, শ্রীকৃষ্ণের ননীভক্ষণ, গোষ্ঠবিহার ইত্যাদি এবং রামায়ণীয় দৃশ্যের মধ্যে রাম-রাবণের সুপরিচিত যুদ্ধদৃশ্য, বানরসেনা ও রাক্ষসের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কালী, দশভুজা মহিষমর্দিনী, শিবদুর্গা, শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের হরিনাম সংকীর্তন দৃশ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সামাজিক দৃশ্যের মধ্যে রমণীর কেশবিন্যাস, নারীর শিবলিঙ্গপূজা ইত্যাদি উল্লেখ করার মতো।

ক্ষীরপাই-এর 'হাটতলায়' শীতলানন্দ শিবের 'আটচালা' রীতির মন্দির ১২৪৬ (১৮৩৯ খৃস্টাব্দ) বঙ্গাব্দে আরম্ভ হয়ে শেষ হয় ১২৪৭ সালের (১৮৪০ খৃস্টাব্দ) জ্যৈষ্ঠ মাসে। মন্দিরগাত্রে কিছু পোড়ামাটির মূর্তি আছে। অদ্বৈতচরণ পাণি মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বোক্ত দয়ালবাজারের কাছাকাছি কদমকুণ্ডির মোড়ে (পাকা রাস্তার ধারে) খড়কেশ্বর শিবের 'আটচালা' রীতির বিশাল মন্দির ১৭৮৩ শকাব্দ এবং ১২৬৮ বঙ্গাব্দে (১৮৬১ খৃস্টাব্দ) গঙ্গাধর দত্ত প্রতিষ্ঠা করেন। সাম্প্রতিক সংস্কারে ইঁটের তৈরি এই মন্দিরের লিপিটি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। বর্তমান লেখক কর্তৃক বহু বছর আগে উদ্ধৃত সেই লিপিটি এখানে যথাযথভাবে পাঠকদের অবগতির জন্য উপস্থাপিত করা হলো :

'শ্রীশ্রী খড়কে/সর/শিবঠাকুর/সকাব্দা ১৭৮৩/৫/২১

সন ১২৬৮ সাল/শ্রীগঙ্গাধর দত্ত'। (এখানে পৃথক পৃথক সারির চিহ্ন আগের মতো ছেদ চিহ্নের দ্বারা সূচিত)। খড়কেশ্বর শিব— খড়গেশ্বর শিব। এই নামের একটি বিখ্যাত প্রাচীন শিবমন্দির আছে খড়গপুরে। এছাড়া আরও কোনও কোনও স্থানে খড়গেশ্বর শিবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

ক্ষীরপাইয়ে আরও অনেক মন্দির বর্তমান। এর মধ্যে গন্ধবণিক জাতির হালদারদের দ্বিতল 'চাঁদনি' (দালান) রীতির মন্দির, পাহাড়িপাড়ায় পাহাড়িদের কয়েকটি মন্দিরের মধ্যে সিংহবাহিনীর 'দালান' মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। 'দালান' মন্দিরটির (পাহাড়িদের) অস্পষ্ট লিপিটি থেকে জানা যায় সেটি ১৬৬৮ শকাব্দ বা ১৭৪৬ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের সামনের দেওয়ালের চারপাশে সুন্দর সুন্দর টেরাকোটা মূর্তি আছে। পাহাড়িদের এই প্রাচীন দালানটি অনেককাল আগেই পরিত্যক্ত। কাছাকাছি একটি মাটির দালানে সিংহবাহিনী দুর্গার প্রতিবছর দুর্গোৎসব হয়। মাটির দেওয়াল বেশ চওড়া এবং কাঠের খুঁটি বেশ শক্ত ও মজবুত।

ক্ষীরপাই চকের কাছাকাছি পাকা রাস্তার ধারে ধ্রুবানন্দ গিরি-প্রতিষ্ঠিত উত্তমানন্দ আশ্রমে বহু প্রাচীন একটি 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরকে বেশ কয়েক বছর আগে নবকলেবরে সংস্কার করা হয়েছিল। মন্দিরের কেন্দ্রীয় 'রত্ন'টি অবিকৃত থাকলেও চারকোণের প্রাচীন ৪টি 'রত্ন' ভগ্ন জীর্ণ হয়ে পড়ায় নতুন করে তৈরি করে দেওয়া হয়। আরও কয়েকটি ছোট ছোট চূড়া বসিয়ে দেওয়া হয়। মন্দিরের স্থাপত্যকৌশল ও গঠন ভালো করে লক্ষ্য করে বলা যায়, এটি পূর্বোক্ত রাধানগর মন্দিরের (১৭১৮ খৃস্টাব্দ) সমসাময়িক বলে অনুমান।

শুধুমাত্র প্রাচীন মন্দিরের জন্য নয়, একটি ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে ক্ষীরপাই উল্লেখযোগ্য।

শতবর্ষে ‘ডাকঘর’

নববর্ষে সংস্কার ভারতীর অভিনব দেওয়ালপঞ্জী

বিকাশ ভট্টাচার্য

১৩১৮ সালে ভাদ্র মাসের শেষাশেষি শান্তিনিকেতনে বসে কবি ‘ডাকঘর’ লেখেন। পুজোর ছুটিতে কলকাতায় এলে বালিগঞ্জে মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে বন্ধুমহলে নাটকটি পড়ে শোনান। ‘ডাকঘর’ প্রকাশিত হয় ১৬ জানুয়ারি ১৯১২। এ বছরটা ‘ডাকঘর’ প্রকাশের শতবর্ষ। সেইসঙ্গে কবির সার্ধজন্মশতবর্ষ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ‘গীতাঞ্জলি’র পর ভারতের স্বরূপ জানবার সুযোগ বেশি এসেছে রবীন্দ্রনাথের রূপকাশ্রয়ী কয়েকটা নাটকে। বিশেষত ‘ডাকঘর’-এ। ডাকঘর-কে আমরা নানা পরিবেশে বিচিত্র সংকট মুহূর্তে দেশে দেশে প্রযোজিত হতে দেখেছি। আজও রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রেক্ষিতের সৃষ্টিক্ষমতা শুধু আমাদের কাছেই নয়— বহু বিদেশীর চোখেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রতি বছরই নতুন বছরের প্রাক্কালে এক একটি অভিনব বিষয় নিয়ে বারো পৃষ্ঠার বহুবর্ণ ক্যালেন্ডার প্রকাশ করে থাকে। কখনও ভারতের উৎসব, কখনও ভারতের লোকনৃত্য, আধুনিক বাংলা থিয়েটার, বাংলার যাত্রাপালা ইত্যাদি। এমনকী ১৮৫৭-এর সার্ধশতবর্ষে ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের চিত্রসহ বিবরণ। স্বভাবতই ‘ডাকঘর’-এর শতবর্ষে সংস্কার ভারতী-র সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জী ১৪১৯-এর বিষয় ‘ডাকঘর’। ‘ডাকঘর’ প্রকাশের শতবর্ষে দেশে-বিদেশে ‘ডাকঘর’ মঞ্চায়নের কিছু দুষ্প্রাপ্য ছবি ও তথ্যে সাজানো হয়েছে বারোটি পৃষ্ঠা।

দেওয়ালপঞ্জীর বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে স্থান পেয়েছে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে ১০ অক্টোবর ১৯১৭-তে মঞ্চস্থ ‘ডাকঘর’-এর ছবি। রবীন্দ্রনাথ-ঠাকুর্দা, গগনেন্দ্রনাথ-মাধব দত্ত, অবনীন্দ্রনাথ-মোড়ল এবং রথীন্দ্রনাথ-রাজকবিরাজ। ‘অমল’ করেছিল কলকাতার ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলের ছাত্র আশামুকুল এবং সুধা অবনীন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে সুরূপা। দুর্লভ এইসব ছবি

সংগৃহীত হয়েছে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র ভবনের আর্কাইভ থেকে। ওখান থেকেই পাওয়া গেছে ১৯৩১-এ জার্মানীতে মঞ্চস্থ জার্মানী ‘পোষ্ট অফিস’-এর ছবি এবং ১৯২৫-এ ইতালির মিলান শহরে এবং ১৯৪৯ সালে নাইরোবি শহরে অনূদিত ‘ডাকঘর’ মঞ্চায়নের দুর্লভ ছবি।

প্রকাশিত হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যেও ‘ডাকঘর’ এ দেশে মঞ্চস্থ হয়নি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র দেবব্রত মুখোপাধ্যায় কৃত এ নাটকের ইংরাজী অনুবাদ ‘পোষ্ট অফিস’ রবীন্দ্রানুরাগী কবি ইয়েটস্-এর প্রযোজনায় ১৯১৩-এর ১০ মে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরের অ্যাবে থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। রবীন্দ্রানুরাগী উইলিয়ম রাদিচের অনুবাদে ‘ডাকঘর’ ইংলন্ডেও মঞ্চস্থ হয়েছে। এসব তথ্য এবং সাধারণের অজানা আরও এক তথ্য ও ছবি পাওয়া গেল এই ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠায়। পোলান্ডের রাজধানী ওয়ারশ-র এক ইহুদি-ঘেটোতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৮.৭.১৯৪২-এ এক ইহুদি ডাক্তার জানুস কোরচখ্ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের অনাথ শিশুদের দিয়ে তাঁরই অনূদিত পোলিশ ‘ডাকঘর’ মঞ্চস্থ করেছিলেন। গ্যাস চেম্বারে যাদের মৃত্যু অবধারিত সেই ইহুদি শিশুদের মধ্যে মানসিক শক্তি সঞ্চারিত করতে ডাঃ কোরচখ রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর-এর দিকে হাত বাড়িয়ে ছিলেন। এসব তথ্য ও ছবি সংগৃহীত হয়েছে দিল্লীর পোলিশ দূতাবাস থেকে।

বাংলা নাট্যচর্চায় রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনায় বহুরূপী ও শম্ভু মিত্রের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তৃপ্তি মিত্র নির্দেশিত বহুরূপীর ‘ডাকঘর’ প্রথম ১৯৫৭-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় নিউ এম্পায়ারে অভিনীত হয়। মণিপুরের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব কানহাইয়ালাল এক বিশেষ নাট্যশৈলীর মাধ্যমে ‘ডাকঘর’ এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। বিশিষ্ট অভিনেত্রী সুলতা দেশপান্ডে ১৯৮৭-র ১৬ মে মারাঠি ‘ডাকঘর’ মঞ্চস্থ করেন।

পাকিস্তানী সরকারের চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে ঢাকায় ‘ডাকঘর’ মঞ্চস্থ হয়। এখন বাংলাদেশে পালাকার ও স্বপ্নদল— দুটি নাট্যগোষ্ঠী নিয়মিত ‘ডাকঘর’ মঞ্চস্থ করে। পালাকার-এর ‘ডাকঘর’ শততম রজনী অতিক্রম করতে চলেছে। এরকমই বহু অজানা তথ্য ও চব্বিশটি দুর্লভ ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে সংস্কার ভারতী-র ‘সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জী ১৪১৯’। আগামী ৩ এপ্রিল ’১২ কলকাতায় মিনার্ভা থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে এই অভিনব দেওয়ালপঞ্জীর উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট কথাশিল্পী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। প্রবেশ অবাধ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভারত সরকারের সংস্কৃতি-মন্ত্রক প্রকাশনায় সহায়তা করেছে। সুলভ মূল্যে এই ক্যালেন্ডার সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

আইনী সমস্যায় মহিলা বনাম মহিলা

অরুণা মুখোপাধ্যায়

উপরোক্ত শিরোনাম প্রসঙ্গে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের আইন-জীবনের অভিজ্ঞতায় একটা পুরাতন উক্তিই আমার মনে পড়ছে এবং কিছু ঘটনা প্রসঙ্গে তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। উক্তিটি হলো 'ননদিনী রায় বাঘিনী' অথবা 'জটিলা কুটিলা'র গল্প। আইনি সমস্যা যেমন পুরুষ ও নারী উভয়েরই সংমিশ্রণে ঘটে, ঠিক তেমনি বাস্তব জীবনে আইনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আবিষ্কার করেছি একটি মহিলার জীবনে তীব্র মর্মান্তিক সমস্যার জন্য দায়ী হলেন প্রধানত অপর একটি নারী— প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষভাবে। এর জন্য অবশ্য কিছু আইনের ত্রুটি সংশোধনেরও প্রয়োজন। কেননা মহিলাদের উপর অত্যাচারের ও অত্যাচারিত হবার সুযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে বিশেষ কয়েকটি আইন। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮ (ক) ধারার প্রয়োগটি যেমন নারীর বিরুদ্ধে প্রকৃত অত্যাচারের ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ, ঠিক তেমনি একটি অত্যাচারিত নারী অপর নারীর প্রতিও অত্যাচার করার সুযোগ পাবেন Protection of Domestic Violence Act (পারিবারিক নির্যাতন রোধের সুরক্ষা আইন)- এর ধারায়। অর্থাৎ বিষয়টি হলো যে ননদ অবিবাহিত অবস্থায় পৈতৃক ভিটাতে ভ্রাতৃবধূর দ্বারা অত্যাচারিত হন, তিনিই আবার শ্বশুরবাড়িতে তাঁরই ননদকে ওই একই ধারার আইনের সুযোগ নিয়ে নির্যাতন করেন। সুতরাং সংবিধানে পুরুষ ও নারীর আইনে সমান সুযোগ প্রদত্ত হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবিকভাবে আইনে কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটে। ৪৯৮ (ক) ধারার অপপ্রয়োগের মাধ্যমে যখন বিবাহিতা মহিলা তার নিরপরাধ শাশুড়ি, অন্ধ ননদ ও স্ট্রোকের রোগী শ্বশুরের বিরুদ্ধে অন্যায় ব্যবহার করেন, যার উদ্দেশ্য হলো স্বামীকে মা-বাবার কাছ থেকে পৃথক করা, সেক্ষেত্রে কিন্তু পুত্রবধূর মায়ের মিথ্যা কারণ দেখানোর প্ররোচনা থাকে। আইন জীবনে দেখেছি, জামাই-এর রোজগারের প্রকৃত অর্থ তার নিজের মাকে কিছুটা না দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে পারে— এই উদ্দেশ্যেই অত্যাচারের মিথ্যা কারণ দেখিয়ে নিজের মেয়ে জামাই-এর মধ্যে মানসিকতায় ফাটল ধরিয়ে দেন।

আদালত চত্বরে আমার মক্কেল স্ত্রীর মাকে বলতে শুনেছিলাম নিজের মেয়েকে— ''জামাই-এর সঙ্গে একমত হয়ে নিজের স্বার্থ বিরোধী কাজ করবি না— শাশুড়িকে যাতে জামাই একটুও সাহায্য না করতে পারে তার জন্য দাবী করবি— সব টাকা নিজে গুছিয়ে নে— কারণ ওই খোরপোষের টাকাতেই আমাদের সংসার চলবে।'' মনে সেদিন দুঃখ হয়েছিল— ভেবেছিলাম নারী জাতির যে

আদর্শ সেবা, প্রেম, পরোপকার সে আজ কোথায়? ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনে (১৯৫৬) বিবাহিতা মেয়েদের, বিধবার, স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েদের জন্য অধুনা অনেক উন্নতিমূলক পরিবর্তন হয়েছে। নিজের পৈতৃক ভিটেতেও থাকার অধিকার তাদের আছে। কিন্তু অধুনা দেখছি ভ্রাতৃবধূরা বিশেষভাবে ভাইয়ের বাক্‌রোধ করে ননদদের বাপের বাড়িতে ঘুরে যাবার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বাধাসৃষ্টি করে ও অবিবাহিতা মেয়েরাও তাদের পিতার মৃত্যুর পর দেখেন যে ভ্রাতৃবধূদের জন্য তাদের বাপের বাড়িতে থাকার পথ বন্ধ। কোনও ক্ষেত্রে জাল উইল প্রদর্শন করে বহু জটিলতার সৃষ্টি করেন ভ্রাতৃবধূরা ননদের বিরুদ্ধে। এর পরিণতি দেখেছি এরা থানা, পুলিশ ও আদালতে মামলা করে ননদদের সমূলে বিনাশের জন্য। যে অবিবাহিতা মেয়ে সারাজীবন সংসারে ভাই, বোন ও মা বাবাকে আর্থিক অনটনেও সেবা করেছেন, তাকেও কটূক্তি শুনতে হয়েছে ভ্রাতৃবধূর কাছে— ''দড়ি, কলসী নিয়ে ডুবে মরতে পারিস না— এখনও বাপের ঘরে মরতে আছিস।'' মহিলা আইনজীবী রূপে ভাবতে আজও লজ্জা করে যে নারী ও পুরুষের বাঁচার জন্য সমান সুযোগ বিভিন্ন আইনে থাকা সত্ত্বেও আজও কি মহিলারা একজোট হয়ে নিজেদের ভগ্নির ন্যায় ননদ মহিলাদের সঙ্গে ও মায়ের ন্যায় শাশুড়িদের সঙ্গে এবং শাশুড়িরাও নিজেদের কন্যায় ন্যায় পুত্রবধূদের সঙ্গে আচরণ করতে কি পারেন না? এর জন্য দায়ী কে? নৈতিকবোধের সামগ্রিক শিক্ষাই-এর জন্য প্রয়োজন। যা আজকের সুসভ্য সমাজে নারীজাতির বাইরের শোভার সঙ্গে অন্তরেরও শ্রী বৃদ্ধি করবে; মঙ্গল ঘটাবে।

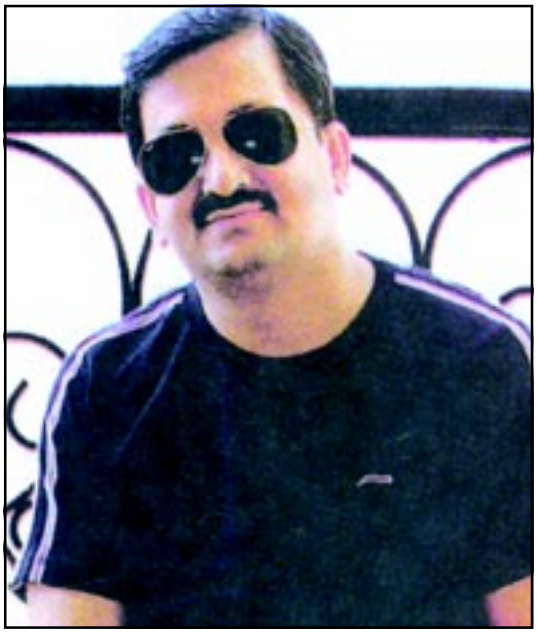

মিশন ফর ভিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কৃতী ছাত্র। বায়োকেমিস্ট্রিতে এম এস সি। তারপরে মার্কেটিং-এ এম বি এ-ও করেছেন। কর্পোরেট জগতে দীর্ঘ ১৬ বছর চুটিয়ে কাজ করার সুবাদে উন্নতি-র সবকটি সিঁড়ির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়ে গিয়েছে। তাঁর নাম মলয় চক্রবর্তী। এখন মানুষের টাকার অভাব হয় না, বরং প্রাচুর্যের তাড়নায় একটা সময় টাকায় অরুচি আসে। কিন্তু 'উপলব্ধি' আসে কি?

মলয়বাবুর বক্তব্য, "মোটা মাইনের চাকরি আপনাকে নিশ্চয়ই অন্যরকমের জীবনযাত্রা উপহার দেবে। কিন্তু যখন আপনি উপলব্ধি করবেন যে ক্যাটার‍্যাক্টের সমস্যায় বিগত ১০-১৫ বছর ধরে কোনও মানুষ যদি তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে থাকেন এবং আপনি যদি মাত্র আড়াই হাজার টাকার বিনিময়ে তাঁর সেই হারিয়ে যাওয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারেন; তবে তার চাইতে বেশি মানসিক সন্তুষ্টি আর কিছুতে নেই।"

এই যাঁর 'উপলব্ধি', মানুষের জন্য কিছু করতে তিনি যে সচেষ্ট হবেন তা বলাই বাহুল্য। আর এই সচেষ্ট হওয়ার নমুনা হলো, সুখের চাকরি ছেড়ে একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (এন জি ও) 'মিশন ফর ভিশন'-এ যোগদান, যে সংস্থাটি গরীবদের অন্ধত্ব দূরীকরণের কাজ করে চলেছে নিরন্তরভাবে। নিজে বাংলাদেশী 'উদ্বাস্তু' পরিবারের ছেলে। ৫০-এর দশকে তাঁর পরিবার কলকাতায় উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসে। ১৯৬৮-তে কলকাতায় জন্ম মলয়বাবুর। এরপর চলে যান মুম্বাই-তে! বাবার ব্যবসাসূত্রে। ব্যবসা মানে মলয়বাবুর বাবা তার-দড়ির খুব সামান্য একটা কারবার ফেঁদেছিলেন এখনকার মুম্বাই তখনকার বোম্বেতে। তারপর মুম্বাইতেই বেড়ে ওঠা। কিন্তু কলকাতার সঙ্গে যোগসূত্রটা বরাবরই বজায় রেখেছিলেন মলয় চক্রবর্তী। পড়াশুনো শেষে যখন বড় চাকরিতে 'জয়েন' করলেন তখনও 'অফিস ট্যুর' বাদ দিয়ে বছরে নিদেনপক্ষে কলকাতায় আসতেন তিনি।

মুম্বাই-তেও গরীব দেখেছেন, কিন্তু বস্তিবাসী কলকাতা তাঁর বুকে যন্ত্রণার ঢেউ তুললো। গ্রামবাংলার দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের যন্ত্রণা ঝাঁ চকচকে কর্পোরেট জগতের ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও তাঁকে বিদ্ধ করে। আর সেই সূত্রেই 'মিশন ফর ভিশন'-এ যোগদান। তাঁর পরবর্তী পরিকল্পনা, "কলকাতা শহরে আমাদের চারটি ক্লিনিক রয়েছে এখন— এন্টালি, বেলেঘাটা, উল্টোডাঙ্গা ও চিড়িয়ামোড়ে। আগামী মাস দু'য়েকের মধ্যে আহিরীটোলা এবং চেতলায় ক্লিনিক খোলা হবে।" জানা যাচ্ছে প্রতিটি ক্লিনিকেই ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার যন্ত্রপাতি রয়েছে। অপট্রিমেট্রিষ্ট (চক্ষু-বিশেষজ্ঞ) এবং অপথ্যালমোলজিস্ট (Ophthalmologist)-রাও রয়েছেন যথারীতি। চেক-আপের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য ৫ টাকা এবং গরীব মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন। একটা চমকপ্রদ পরিসংখ্যান দিয়ে লেখাটার ইতি টানব। গত বছর ১ লক্ষ ৬৪ হাজার মানুষের বিনামূল্যে চক্ষু-সার্জারি করা হয়েছে এবং এই বছর সেই সংখ্যাটা ১ লক্ষ ৮৩ হাজার পেরিয়ে যেতে পারে বলে আশা করছেন এই কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান কাণ্ডারী মলয় চক্রবর্তী।

গত ১৭ মার্চ স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে কলকাতার ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কর্মাসে বাজেট বক্তৃতারত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং সংসদে অর্থ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান যশবন্ত সিন্‌হা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইনস্টিটিউট অব্ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্স অব্ ইন্ডিয়ার সহ-সভাপতি সুবোধ আগরওয়াল। এছাড়াও ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ডঃ ডি আর আগরওয়াল, আর কে ব্যাস, কমল সোমানী, সুভাষ সরাফ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আকাদেমি ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক শিল্পকলা প্রদর্শনী

গত ১ থেকে ৭ মার্চ কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য নাটক সংগীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমি ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক শিল্পকলা প্রদর্শনী ২০১২ আয়োজিত হলো রবীন্দ্রনাথ টেগোর সেন্টার, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্‌স (আই সি সি আর), বিদেশ মন্ত্রণালয়, ভারত সরকারের সহযোগিতায়, কলকাতার হো চি মিন সরণীতে আই সি সি আর-এর নন্দলাল বসু গ্যালারিতে। প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন চিত্রশিল্প শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপিকা ভারতী রায় (সহ-সভাপতি, আই সি সি আর), এবং সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক চিন্ময় গুহ (উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)।

উদীয়মান প্রতিভাদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া ছবিগুলিকে মনোনীত করার জন্য দুটি ভাগে ভাগ করা হয়— একটি ট্র্যাডিশনাল আর্ট, অন্যটি কন্টেম্পোরারি আর্ট। এ বছর ২২৫-এরও বেশি ছবি, ভাস্কর্য ইত্যাদি নিয়ে শুরু হয়েছিল বাছাই পর্ব। এর মধ্যে ১০০টি প্রথমে বাছাই হওয়ার পর, শেষ পর্যন্ত ৮৮টি জায়গা করে নিয়েছিল মূল প্রদর্শনীতে। ছবি বাছাইয়ের কমিটিতে ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী অনিমেষ নন্দী, তপন দাস ও বিশ্বপতি মাইতি।

প্রতি বছরের মত এবারও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রাজ্য আকাদেমি পুরস্কার দেওয়া হলো। দশ হাজার টাকার এই পুরস্কারগুলি পান ট্র্যাডিশনাল আর্ট-এ গীতা কর্মকার (ডোকরা), কার্তিক চিত্রকার (পটচিত্র), এবং উর্মিলা দাস ও জয়া সাউ (কাঁথা স্টিচ এম্ব্রয়ডারি); কন্টেম্পোরারি আর্ট-এ পুরস্কার পান নিত্যানন্দ গায়েন (গ্রাফিক্‌স-এচিং), পার্থপ্রতিম রায় (ড্রয়িং-পেনসিল স্কেচ), এবং রিন্টু রায় ও রাজরাপ্পা রায় (পেন্টিংস-অ্যাক্রিলিক অন ক্যানভাস)।

সমাবেশ সমাচার

রক্তদান শিবির

গত ৪ মার্চ উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার ব্যারাকপুরের কর্ণমাধবপুরে বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে মোট ৫০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন।

মঙ্গলনিধি

গত ২ মার্চ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী খণ্ডের দৌলতপুর মণ্ডল কার্যবাহ বভ্রুবাহন মন্ডলের পিতা দীপক কুমার মণ্ডল তাঁর মেয়ে তনুশ্রী মণ্ডলের বিয়ে উপলক্ষে সমাজ সেবার উদ্দেশ্যে উত্তরবঙ্গ সেবা ভারতীর নামে ৫০১ টাকা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রচারক গৌরাঙ্গ দাস মহাশয়ের হাতে তুলে দেন।

***

বাঁকুড়া জেলার ছাতনা নিবাসী সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় গত ১০ মার্চ তাঁর পুত্র শ্রীমান গোপাল মুখোপাধ্যায় (বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের সদস্য)-এর শুভ বিবাহ উপলক্ষে সামাজিক কাজের জন্য একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৫০০ টাকা মঙ্গলনিধি সঙ্ঘের সহ-জেলা কার্যবাহ তরুণ কুমার লায়েকের হাতে সমর্পণ করেন।

***

আর এস এসের বাঁকুড়া জেলার আঁধার-থোল মণ্ডল কার্যবাহ শমিত মন্ডলের পিতা নারায়ণচন্দ্র মন্ডল তাঁর কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানে ১০০১ টাকা মঙ্গলনিধি সঙ্ঘের সহ-জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ আশীষ কুমার মন্ডলের হাতে সমর্পণ করেন।

***

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি উত্তর চব্বিশ পরগণার জামদানী নিবাসী সেবা-ভারতীর কার্যকর্ত্রী শাশ্বতী নাথ এবং সুকুমার নাথ তাঁদের কন্যা সুপ্রীতি নাথের বিবাহ উপলক্ষে ৫৭০০ টাকা মঙ্গলনিধি প্রদান করেছেন। মঙ্গলনিধি গ্রহণ করেন আর এস এসের উত্তর চব্বিশ পরগণা বিভাগ সঙ্ঘচালক প্রলয় তলাপাত্র।

***

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা বিভাগ সহ-কার্যবাহ ডায়মন্ডহারবার সুকুমার নস্কর তাঁর পুত্র সুশ্রুতের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে গত ২৬ জানুয়ারি ২০০১ টাকা মঙ্গলনিধি প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ সঙ্ঘচালক অতুল বিশ্বাস, বিভাগ সঙ্ঘচালক ডঃ জয়ন্ত রায়চৌধুরী, সোনারপুর মহকুমা সঙ্ঘচালক পৃথ্বীশ পত্রনবীশ প্রমুখ। অনুষ্ঠান পত্র সংস্কৃতে ছাপা হয়।

কলকাতায় চৈত্র শুক্লা প্রতিপদে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান

????

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত বছরের মতো এবছরও অত্যন্ত ধূমধাম সহকারে ভারতীয় হিন্দু নববর্ষ (চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ) পালন করল ভারতীয় নববর্ষ উৎসব সমিতি। গত ২৩ মার্চ সন্ধ্যায় মূল অনুষ্ঠান হলো কলকাতার পাথুরেঘাটার বিনানী সভাগারে। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে এই তিথি থেকেই শুরু হলো ২০৬৯ বিক্রম সংবত তথা ৫১১৪ যুগাব্দ।

অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রসিদ্ধ সমাজসেবী সীতারাম শর্মা ভারতমাতার চিত্রের সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিল্পপতি সজ্জন ভজনকা, অশোক মাহেশ্বরী, সুদূর কাশীধাম থেকে আগত পণ্ডিত বিনয় ঝা, বিমল লাট এবং বিজয় কুমার গারোদিয়া প্রমুখ। সকলেই ভারতমাতার চিত্রে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

এদিনের বক্তা পণ্ডিত বিনয় ঝা বলেন, ভারতীয় কালগণনা নির্ভুল এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। চৈত্রমাসেই নতুন বছর শুরু হয়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী এবং অন্যান্য যাবতীয় গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বিষয়ে জানতেন। সেকথাই আজকের বিজ্ঞান বলছে। যে ইংরেজী ক্যালেন্ডার ব্যবহৃত হয় তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। ভারতবর্ষেই বিশ্বের সকল মত-পথ, পন্থ-উপপন্থের স্বীকৃতি এবং আচরণের স্বাধীনতা রয়েছে। এটাই হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য। জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্ম এবং কর্ম অনুযায়ী ফলভোগ— হিন্দুরাই বিশ্বাস করে। ঠিক ঠিক কেন্দ্রে বসে গণনা করে পাঁজি (পঞ্চাঙ্গ) তৈরি করলে তা নির্ভুল হয়। বর্তমানে ভারতের কেন্দ্র হলো বিদিশা।

সভার শুরুতে মঞ্চস্থ সম্মানীয় সকলকে সমিতির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। সমিতির সচিব মনমোহন গারোদিয়া সমিতি গঠন ও সমিতির উদ্দেশ্য সকলকে বুঝিয়ে বলেন। প্রথম বক্তা সমাজসেবী এবং বনবন্ধু পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সজ্জন ভজনকা ভারতীয় পরম্পরার সঙ্গে ঘর-পরিবার ও সমাজকে যুক্ত করার কথা বলেন। সভার অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন— তাজা টিভি-র নির্দেশক বিশ্বম্ভর নেবর, অশোক মাহেশ্বরী, বিমল লাট, সভাপতি সীতারাম শর্মা, প্রাক্তন পুলিশ অধিকর্তা সুলতান সিং (বর্তমানে বিধায়ক এবং রাজ্য পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান) প্রমুখ। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক স্বস্তিকার ট্রাস্টী এবং সমাজসেবী যুগলকিশোর জৈথেলিয়া, বিজয় কুমার গারোদিয়া এবং সত্যনারায়ণ দেওরালিয়া প্রমুখ।

এদিন হলের ভিতরে ও বাইরে রীতিমতো ভীড়। বাইরে সি সি টিভিতে ভিতরের অনুষ্ঠান দেখা যাচ্ছিল। মঞ্চে ও মঞ্চের সামনে বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

এদিনকার বিশেষ আকর্ষণ ছিল সঙ্গীত এবং গীতি-নৃত্য। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পূর্ণিমা কোঠারী। সভার শেষে সকলকে প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

শোকসংবাদ

গত ১২ মার্চ জলপাইগুড়ির স্বস্তিকার এজেন্ট এবং সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক বাপী গোস্বামীর মাতৃদেবী কণারাণী গোস্বামী শ্বাসকষ্টজনিত রোগে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৬৫ বছর। ৫ সন্তান ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন তিনি।

***

পুরুলিয়া জেলার সঙ্ঘের ঝালদা খণ্ডের পাতয়াড়ি শাখায় স্বয়ংসেবক জ্যোর্তিময় মাহাতো (স্বপন)-এর পিতৃদেব অনন্তরাম মাহাতো ৭২ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী।

***

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণ কলকাতার সভাপতি সত্যপ্রিয় ঘোষ গত ২৭ ফেব্রুয়ারি রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘ ২৫ বছরেরও বেশি সময় তিনি সঙ্ঘ সহ সঙ্ঘের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। স্ত্রী সহ তাঁর এক কন্যা, জামাতা এবং নাতনী বর্তমান।

***

কাঁথির এগরা নিবাসী মেদিনীপুর বিভাগ কার্যবাহ প্রকাশ মণ্ডলের পিতা হেমন্ত কুমার মণ্ডল গত ২ মার্চ রাত্রে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর স্ত্রী ও তিন পুত্র ২ কন্যা বর্তমান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

নারী পরিচালকদের নাট্যোৎসব
‘নারীর মঞ্চ’ ২০১২

দেবাদিত্য চক্রবর্তী

নান্দীপট আয়োজিত মহিলা পরিচালকদের এক গুচ্ছ নাটকের উৎসব সম্প্রতি হয়ে গেলে মিনার্ভা থিয়েটারে। এখন প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে শুধুমাত্র মহিলা পরিচালকদের নাটক নিয়েই উৎসব করার প্রয়োজন কোথায়? বিশিষ্ট নাট্যপরিচালিকা সোহাগ সেনের মতে, একটা সময় তার মনেও এই প্রশ্নটা আসত। কিন্তু প্রয়োজন না থাকলে বিশ্বজুড়ে এরকম উদ্যোগ দেখা যেত কি? অপর পরিচালিকা অর্পিতা ঘোষ মনে করেন নাটক তৈরির সময় তিনি নারী বা পুরুষ নন, শুধুমাত্র পরিচালক। কিন্তু এটাও ঠিক নারী এবং পুরুষদের দেখার দৃষ্টি আলাদা। সোহাগ সেনেরও একই সুর, ‘‘পুরুষ আর নারীর দৃষ্টিকোণের তফাৎ আছে।’’ এই দৃষ্টিকোণের পার্থক্যে নাট্য প্রয়োগ কি বিশিষ্টতা পেতে পারে, সেই অভিজ্ঞতা কয়েক হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ করলেন এ ক’দিন কবি শঙ্খ ঘোষ কৃত নামকরণ—‘নারীর মঞ্চ’ উৎসবে।

প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীমতি সুচিত্রা ভট্টাচার্য। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন, ‘‘মেয়েদের চোখেও সমাজকে দেখার প্রয়োজন আছে। তাই এরকম উৎসবেরও প্রয়োজন আছে।’’

নান্দীপট কর্তৃপক্ষের থেকে বলা হয় যে, গত কুড়ি তিরিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে মহিলা নাট্য পরিচালকরা যে কাজ করে চলেছেন, তাকে আরও গতিশীল করা এবং পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করার উদ্দেশ্যেই এই উৎসব।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী চিত্রা সেনকে বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া, ‘শুভদীপ পাল স্মৃতি স্মারক’ সম্মান প্রদান করা হয় বর্ষীয়ান ব্যাক স্টেজ কর্মী শ্রী রতন দাসকে— যা থিয়েটারের ক্ষেত্রে এক মহান উদ্যোগ।

প্রথমদিনের নাটক ছিলো ‘রঙরূপ’ প্রযোজিত সীমা মুখোপাধ্যায় পরিচালিত, ‘মায়ের মতো’। আজকের দিনে ঘরে ঘরে যে ঘটনা দেখা যায়— একাধিক পুত্র কন্যা থাকা সত্ত্বেও বিধবা বৃদ্ধা মায়ের নিঃসম্বল একাকী জীবন, এই নাটকের মায়ের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। সন্তানরা খবর নেওয়ার জন্য এলেও তার পিছনে থাকে কোন গূঢ় স্বার্থ। মা সব বুঝেও সন্তানদের ভালোর জন্য নিজেকে ব্যবহৃত হতে দেন, কিন্তু তাদের কাছে মাথা নত করেন না। এই আত্মসম্মানবোধ সব নারীরই বোধহয় থাকা প্রয়োজন। শেষ দৃশ্যে পঁচিশ বছর সম্পর্ক না রাখা স্বার্থপর বড় ছেলের প্রতি মায়ের সংলাপ, ‘‘আমি কি তোমার সেই পঁচিশ বছর আগের আঁকড়ে ধরা মা? আমি তোমার মায়ের মতো একজন’’। এখানেই নাটকটির নামকরণের সার্থকতা।

অসমের ‘সিগাল থিয়েটার’ ‘ভাগীরথী’র নির্দেশনায় অভিনয় করলেন শেক্সপিয়ারের ‘জুলিয়াস সীজার’ অসমীয়া ভাষায়। এই নাটকে ভাগীরথী প্রতীকিভাবে অসমের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছেন। সেই প্রেক্ষিতে ব্রুটাসের এই সংলাপটি তাৎপর্যপূর্ণ— ‘রক্তপাতের দ্বারা গণতন্ত্র স্থাপন করা যায় না’।

ভাগীরথীর আলোক পরিকল্পনা এবং আবহ দৃশ্য পরম্পরার সঙ্গে সুপ্রযুক্ত।

‘অন্‌সম্বল’ নাট্যদল সোহাগ সেনের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করলেন নাটক— লাল বাক্স। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতবর্ষে যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলছে তাতে সাধারণ মানুষ কতটা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে তা বোঝা যায় নাটকটি দেখলে। লাল বাক্সটি মানুষের এই সন্ত্রাস

নারীর মঞ্চ ২০১২-এর উদ্বোধনে সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য।

ভীতির কারণ হিসেবে কাজ করেছে নাটকে। আসলে দেশের বিভিন্ন বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর, মানুষের এখন পরিচয়হীন অবাঞ্ছিত বাক্সপ্যাঁটরা দেখলেই, প্রথমেই তার বোমার আশঙ্কা মাথায় আসে। কয়েকটি বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে নাটকটি। প্রতিটি ঘটনাক্ষেত্রে একটি লাল বাক্স এসে উপস্থিত হওয়ার পরেই ঘটে, ঘটনাপ্রবাহের নেতিবাচক পরিবর্তন। যেমন, দুই মধ্যবয়সী পুরুষ এবং নারীর অবৈধ প্রেমের স্থানে লাল বাক্স দেখে তারা বোমের ভয় পায় এবং শেষ অবধি তাদের প্রেমের ইতি ঘটে, আর জানা যায় বাক্সটিতে একজোড়া প্রেমিক প্রেমিকার পলায়নের সরঞ্জাম ছিল। এই ঘটনায় ভয়ের সঙ্গে হাস্যরসের উপাদানও আছে।

সোহাগ সেন বরাবরই নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকেন নাট্যকলা নিয়ে। এই নাটকটিকেও সেরকম একটি পরীক্ষামূলক প্রযোজনা বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীরপত্র' হিন্দীতে অভিনয় করলেন দু'জন— প্রথমার্ধে সীমা বিশ্বাস এবং দ্বিতীয়ার্ধে গীতা গুহের পরিচালনায় সবিতা কুন্দ্রা। দুটিই একক অভিনয়। একই কাহিনীর দুটি নিবেদনের মধ্যে তুলনা করলে প্রথমেই বলতে হয় পোষাকের কথা। একদিকে সীমা বিশ্বাস পরেছিলেন হলুদ শাড়ী এবং লাল ব্রাউজ— একদম বাঙালী পোষাক। অন্যদিকে সবিতা পরেছিলেন ক্রীড়াবিদ্‌দের মতো 'বডি টাইট' কালো প্যান্ট ও গেঞ্জি। দ্বিতীয়ত, সীমা অভিনয় শুরু করলেন সরাসরি মৃণালের স্বামীকে চিঠি লেখা দিয়ে— শ্রীচরণকমলপদেষু বলে। অপর দিকে সবিতা মৃণালের মেয়ের মৃত্যুর কথা দিয়ে শুরু করে ক্রমশ প্রবেশ করলেন চিঠি লেখায়। গীতা গুহের পরিচালনা এবং সবিতার কাজকে সম্পূর্ণ সম্মান জানিয়েই বলতে হচ্ছে, সীমা বিশ্বাসের অভিব্যক্তি, স্বরক্ষেপণ এবং অভিনয় দর্শকের মন জয় করেছে।

'প্রাঙ্গণে মোর' (ঢাকা) পরিচালিকা নুনা আফরোজের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করলেন রবি ঠাকুরের 'চার অধ্যায়' অবলম্বনে-'স্বদেশী।'

অতি কল্পনাপ্রবণ এক বিধবা যুবতী 'বঁএসা'র উন্নাসিকতার, অন্যকে হেয় করার এবং অতিরিক্ত কামনা বাসনা পরিণতিতে কিভাবে সম্পূর্ণ উন্মাদনায় পরিণত হয়, তাই নিয়েই নাটক— ইচ্ছের অলিগলি। 'মনোহরপুকুর আরশি'র প্রযোজনায় একটি বিদেশী কাহিনীকে বাংলায় রূপান্তর ঘটিয়ে মঞ্চস্থ করলেন পরিচালিকা অবন্তী চক্রবর্তী। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর কাহিনী বর্ণনা করেছেন 'পঞ্চম বৈদিক' অর্পিতা ঘোষের পরিচালনায়। কাহিনী সূত্র— মহাভারত এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিদায় অভিশাপ'।

দেবযানীর প্রেমের ক্ষেত্রে বার বার বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়ার কাহিনীই নাটক— 'এবং দেবযানী'। শুদ্ধ বাংলায় ছন্দ মিলিয়ে সংলাপ, অপূর্ব সঙ্গীত এবং নৃত্য পরিকল্পনা যুক্ত অপেরাধর্মী এই নাটকটি বর্তমান বাংলা থিয়েটারে একটি ব্যতিক্রমী প্রযোজনা। শেষে নান্দীপট নাট্যগোষ্ঠীকে ধন্যবাদ— 'নারীর মঞ্চ' অনুষ্ঠিত করার জন্য এবং আগামী বছরের জন্য রইল আগাম শুভেচ্ছা।

শব্দরূপ-৬২০ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১		২	■	৩			
	■	৪			■	■	■
■	৫		■	৬		৭	
■		■	■	■	■		■
■		■	■	■	■		■
৮			৯	■	১০		■
■	■	■	১১			■	১২
১৩				■	১৪		

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. সর্প, **৩.** সিন্ধুদেশের রাজা; দুর্যোধনের ভগিনী দুঃশলার পতি, **৪.** ভূমিতে বিন্দু পাতাদি দ্বারা ভবিষৎকথন, **৫.** ''যত্র জীব, তত্র—'', **৬.** কুকুর, **৮.** অধিমাস, যাতে হিন্দুর ক্রিয়াকর্ম নিষিদ্ধ, **১০.** শ্লীপদ, এই রোগে পায়ের অতিরিক্ত স্ফীতি হয়, **১১.** সূর্যবংশীয় প্রথম রাজা, **১৩.** সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম, **১৪.** মাদারফল।

উপর-নীচ : ১. শুভকর্মে পুরনারীগণের মুখধ্বনি বিশেষ, **২.** ''মোদের —মোদের আশা, আমরি বাংলাভাষা'', **৩.** সঙ্গীতাদির সহিত আনন্দ সম্মিলন, **৫.** কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত চেদি দেশের রাজা, **৭.** রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ, **৯.** অশ্বপালক, **১০.** কৃষ্ণের বাল্যলীলাভূমি; গোষ্ঠ, **১২.** বৃহস্পতির পুত্র, শুক্রের শিষ্য।

সমাধান
শব্দরূপ-৬১৭
সঠিক উত্তরদাতা
অশোক দত্ত
শিবপুর, হাওড়া

■	জ	■	য	■	স্ব	স্তি	ক
■	রা	ঘ	ব	■	রা	■	ম
অ	■	■	নি	স্তে	জ	■	লে
ল	ল	স্তি	কা	■	■	■	কা
কা	■	■	■	কা	ল	নে	মি
তি	■	চ	ণ্ডা	ল	■	■	নী
ল	■	ড়	■	কে	শ	ব	■
কা	র্তি	ক	■	তু	■	লি	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৬২০ সংখ্যার সমাধান আগামী ৩০ এপ্রিল, ২০১২ সংখ্যায়

জনমেজয়-বৈশম্পায়ন সংবাদ

আক্রান্ত হলেও পাল্টা আক্রমণ না করার নীতি নিতেই হীনবল হিন্দুরা

কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী

জনমেজয় বললেন, হে মহর্ষি, প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রী নারদকে বলেছিলেন, এই মহাভারতে কলিকালে হিংসা-অহিংসা বিষয়ে প্রবল বিতর্ক হবে। শ্রী নারদ এই কথাটি শৌনক ঋষিকে বলেছিলেন শুনতে পাই। আপনি অনুগ্রহ করে এই বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন। আমি জানার জন্য অধীর।

বৈশম্পায়ন সানন্দে বললেন, হে কুরুকুলপতি, আমি তোমার সুবিপুল অনুসন্ধিৎসা দেখে চমৎকৃত। তোমার কৌতূহল আমি অবশ্যই মোচন করব। তুমি শ্রবণ কর। সত্য ও ত্রেতা যুগে হিংসার বদলে হিংসা এই নীতি প্রচলিত ছিল। আমাদের এই দ্বাপর যুগেও এই নীতি অনুসৃত হচ্ছে। কিন্তু কলিযুগে ভারতবর্ষে অহিংসা নীতির হঠাৎ প্রচলন হবে। সেই নীতির মূল কথা— তুমি আক্রান্ত হবে, কিন্তু আক্রমণ করবে না। তুমি শত্রুর হাতে নিশ্চিত নিহত হবে জেনেও, সামান্যও প্রতিরোধ করবে না।

জনমেজয় চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, ঋষিবর, সে কি! মানুষের পরম ধর্ম তো আত্মরক্ষা করা। ভগবান মনু তো বলেছিলেন, সতত আত্মরক্ষা করবে। এটি হিন্দুধর্মের বড় শিক্ষা। আমি পরপীড়ন করব না, কিন্তু যদি কেউ আমাকে পীড়ন করতে আসে আমি তাকে বাধা দেব, প্রয়োজনে তাকে বধ করব। এইটেই ত হলো মানুষের বেঁচে থাকার প্রথম পাঠ।

বৈশম্পায়ন বললেন, হে নরাধিপ, কলিযুগে এই বাস্তব সত্য ও নীতি থেকে হঠাৎ হিন্দুরা বিচ্যুত হবে এবং তার ফলে শুরু হবে তাদের মহাপতন।

জনমেজয় বললেন, হে ত্রিকালদর্শী ঋষি, আপনি কি বলছেন! শুনে আমার শিরঃঘুর্ণন হচ্ছে, আমি চোখে অন্ধকার দেখছি, আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হচ্ছে। আপনি দয়া করে এই বিষয়টি বিশদভাবে বলুন।

বৈশম্পায়ন শান্ত কণ্ঠে বললেন, হে কুরুকুলপতি, আমি সবিস্তারেই বলছি, তুমি শ্রবণ কর। হিন্দুধর্ম এখন সসাগরা পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ বিস্তৃত। এর কারণ সত্য ও ত্রেতা যুগে রাজন্যবর্গ হিংসার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। শত্রু আক্রমণ করবে বুঝতে পেরে আগেভাগেই তাঁরা আক্রমণোদ্যত ছিলেন। বর্তমান দ্বাপর যুগেও রাজন্যবর্গ হিংসার নীতিতে গভীরভাবে বিশ্বাসী। কিন্তু কলিযুগে হঠাৎ অহিংসার প্রচার হবে। মার খাব তবু মারব না, নিশ্চিত শত্রুর দ্বারা নিহত হব জেনেও প্রতিরোধ করব না— এই হবে সে-সময়ের নেতৃবৃন্দের নীতি। ফলে বহিঃশত্রু তাদের আক্রমণ করবে, পরাজিত করবে এবং তাদের ধর্ম হিন্দুদের উপর চাপিয়ে দেবে। ফলে হিন্দুধর্ম বহির্ভারতে তো নয়ই এমনকী ভারতেই কোণঠাসা হয়ে যাবে।

জনমেজয় বললেন, মুনিবর, আপনি এ কি কথা শোনাচ্ছেন? আমার অন্তঃকরণ যে যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আপনি বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করবেন?

বৈশম্পায়ন বললেন, হে নরবর, তুমি নিশ্চয়ই অবগত আছ যে যখন একটি জাতি ধ্বংসের গহ্বরে বর্ষার বারিধারার মতো ধাবিত হয় তখন সেই জাতির সর্বস্তরের মানুষের কি জ্ঞানী, কি মূর্খ— সকলের বিপরীত বুদ্ধি হয়। কলিকালে ঠিক এমনি হবে। হিন্দুদের অহিংসাশ্রয়ী দেখে সে সময় দুটি বড় সেমেটিক মতবাদ— খৃস্টান মতবাদ ও মুসলমান মতবাদ হিন্দু ধর্মকে পিষে মারবে। সেই সময় যদি কেউ সৎ বুদ্ধি দিয়ে হিন্দুদের শত্রু প্রতিরোধের কথা বলে, হিংসার বদলে হিংসার কথা বলে তখন বাকিরা এদের তারস্বরে সাম্প্রদায়িক, সংকীর্ণমনা ইত্যাদি বলে দূরে সরিয়ে দেবে।

জনমেজয়ের চক্ষুদ্বয় সজল হলো। তিনি আকুল কণ্ঠে বললেন, হে সর্বজ্ঞ ঋষিবর, তাহলে কি হিন্দুধর্ম ধ্বংস হয়ে যাবে?

বৈশম্পায়ন নিবাতশান্ত কণ্ঠে বললেন, হে কুরুবর, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর- সৃষ্ট সনাতন হিন্দু ধর্ম কি ধ্বংস হতে পারে? কলিযুগে এক সময়ে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন, তিনি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের মতো কলিযুগের আদর্শ— মারের বদলে মার, হিংসার বদলে হিংসা— যা সে সময়ের মুসলমানদেরও আদর্শ এবং রণকৌশল হবে— সেটি অনুসরণ করবে। তখন পুনরায় হিন্দুধর্মের গ্রহণদশা বিদূরিত হবে— হিন্দুধর্ম বর্তমানকালের মতো সারাবিশ্বে বিস্তৃত হবে।

জনমেজয়ের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হলো, চক্ষু বিস্ফারিত হলো। তিনি সানন্দে শুধালেন, মুনিবর, কবে সেই মহান হিন্দু নেতার আবির্ভাব হবে, কোথায় তিনি ভূমিষ্ঠ হবেন? কি তাঁর নাম?

বৈশম্পায়ন পরম তৃপ্তিতে বললেন, আমি তোমাকে যথাসময়ে বলব, আমি ভীষণ ক্লান্ত। আমার একটু নেশার দরকার। তুমি আগে আমার জন্য তাম্বুলের ব্যবস্থা কর। বারাণসীর তাম্বুল হলে ভাল হয়। জনমেজয় শিশুর মতো আনন্দে বললেন, তথাস্তু।

।। চিত্রকথা।। শ্রীরামের পূর্বপুরুষ দিলীপ।। ১৭

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

আনন্দ সংবাদ

৩৪ পাতার 'স্বস্তিকা' ৪২ পাতায়

আনন্দ সংবাদ

জাতীয়তাবাদী চেতনার নির্ভীক মুখপত্র হিসেবে গত ৬৪ বছর ধরে যে নির্ভীক সংবাদ পরিবেশন করে আসছিলাম আমরা, ইদানীং দেশের সংকটময় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তা যেন আর ৩৪ পাতায় কুলোচ্ছিল না। তার ওপরে নিউজপ্রিন্ট ও ছাপার খরচের দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় আমরা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একান্ত অপারগ হয়েই দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু তখন থেকেই পাঠকদের চাহিদা মেনে তাঁদের হাতে নতুন কিছু তুলে দেওয়ার ইচ্ছে গুঞ্জরিত হচ্ছিল 'স্বস্তিকা'র অন্দরে। এরই ফলশ্রুতিতে ৩৪ পাতার 'স্বস্তিকা' রূপান্তরিত হচ্ছে ৪২ পাতায়। মানে আরও বেশি জাতীয়তাবাদী সংবাদ, নির্ভীক প্রতিবেদন, পুরনো বিষয়ে বৈচিত্র্য আনার পাশাপাশি নতুন বিষয়ের ভাবনা, সবমিলিয়ে নবরূপে উপভোগ্য। আগামী নববর্ষ সংখ্যা থেকেই। একই দামে। বিরাট আর্থিক ঝুঁকি নিয়েই 'স্বস্তিকা'কে আরও ঝকঝকে তকতকে করার চেষ্টা হচ্ছে। স্রেফ আপনাদেরই ভরসায়।

—স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট